সমাজ বিপ্লবে
সংস্কৃতির প্রশ্ন ও ভারতীয় সমাজ

সুকোমল সেন

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০
সুকোমল সেন

প্রকাশক
কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক
উষা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯ সি বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৬

সুন্দর পৃথিবী গড়বার জন্য
যাঁরা আত্মদান করেছেন
যাঁরা সংগ্রাম করছেন
তাঁদের উদ্দেশ্যে

উপস্থাপনা

১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে গর্কী বলেছিলেন, 'যে শ্রমের প্রক্রিয়া একটি দ্বিপদ প্রাণীকে মানুষে রূপান্তরিত করেছে এবং সৃষ্টি করেছে সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি তার ভূমিকা কখনই গভীরভাবে এবং যথাযথ পুঙ্খানুপুঙ্খতার সঙ্গে আলোচিত হয়নি। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই ধরনের গবেষণা শ্রমের শোষকদের স্বার্থ রক্ষা করে না।'"

গর্কীর এই মন্তব্য খুবই সত্য ছিল এবং আজও তা সত্য। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করতে যেয়ে শ্রমিকের শ্রম-শক্তি, শ্রম-শক্তির বিক্রয় এবং তার মধ্য দিয়ে পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চয়—এই অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াটাই প্রধান আলোচনা ও গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে মেহনতী মানুষ আজ পুঁজির বাজারে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং তারই ফলে গড়ে ওঠে পুঁজিপতির মুনাফা এবং সমস্ত পার্থিব সম্পদ, সেই মেহনতী মানুষের শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যে আবার গড়ে উঠেছে পৃথিবীর সমগ্র সংস্কৃতির মূল উপাদানগুলি—একথা প্রায়ই বিস্মৃতির গহ্বরে আড়াল হয়ে যায়।

পৃথিবীর সমগ্র শিল্প সংস্কৃতির সৃষ্টি কিভাবে হল, এই প্রশ্ন উঠলে স্বভাবতই সামনে ভেসে ওঠে কিছু বুদ্ধিজীবীর ছবি, যেন তাঁদের বুদ্ধি-বৃত্তির ফলেই সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক সম্পদের উপাদান সমূহ।

কিন্তু মানুষের হাতে পাথর থেকে প্রথম ছুরিখানা তৈরী হবার মুহূর্তটিতে বা ক্রমে ক্রমে সেই ছুরিখানাকে মেজে-ঘষে সুঠাম ও চাকচিক্য মণ্ডিত করার মুহূর্তগুলিতে আধুনিক অর্থে যাকে শিল্পী বলা হয় সেই শিল্পীর কোন অস্তিত্ব ছিলনা। যে মানুষ বনে জঙ্গলে পশু শিকার করত আর বৃক্ষের ফল আহরণ করত, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সেই আদিম মানুষের হাতেই তো পাথর থেকে প্রথম ছুরিখানার সৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই প্রথম যুগের মানুষই তো আবার সেই এবড়ো-খেবড়ো ছুরিটাকে মসৃণ করে তুলেছিল। কাজেই আদিম মানুষের যে শ্রমের প্রক্রিয়া মসৃণ হাতিয়ারটিকে সৃষ্টি করল এবং তা করল সৌন্দর্যের নিয়মানুসারেই, পৃথিবীর শিল্প সংস্কৃতির বুনিয়াদ সৃষ্টিতে

সেই শ্রমের প্রক্রিয়ার বিষয়টির গভীর অনুসন্ধান ব্যতিরেকে এ জগতের শিল্প-সংস্কৃতির মূল সূত্রটির নাগাল পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রম-শক্তির শোষণের বিষয়টি এবং সেই শোষণ মুক্তির প্রশ্নটি অবশ্যই বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হিসাবে বিবেচ্য, কিন্তু শোষণ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শোষণের অবসানের বিষয়টি যেমন মুখ্য তেমনি সেই প্রক্রিয়ায় শোষণ-মূলক ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নটিও গৌণ নয়।

প্রথমতঃ ভুলে যাওয়া হয় অথবা অস্বীকারই করা হয় পৃথিবীর সাংস্কৃতিক সম্পদ সৃষ্টিতে শ্রমের প্রক্রিয়ার ভূমিকাটিকে। বুঝতেই দেওয়া হয় না যে মানব সমাজের সৃষ্টির প্রথম যুগে মানুষই ছিল শিল্পী-মানুষ। একমাত্র সমাজের শ্রেণী বিভাগের উদ্ভবের মধ্য দিয়েই ঘটল কায়িক ও মানসিক শ্রমের পার্থক্য এবং কায়িক শ্রমদানকারীরা হয়ে পড়ল অশিল্পী আর মানসিক শ্রমদানকারীরা হয়ে গেল শিল্পী।

দ্বিতীয়তঃ এটাও বুঝতে দেওয়া হয় না যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে মানুষের শিল্পী ও অশিল্পী এই দুই গোষ্ঠিতে বিভক্তিকরণ এবং প্রথমোক্তদের উত্তম এবং শেষোক্তদের অধম এই দুই দলে বিভাজন শোষণেরই একটি প্রক্রিয়া। আর এ শোষণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যুগে যুগে গড়ে উঠেছে যে ভাবাদর্শ তা শোষক শ্রেণীর সুরক্ষার স্বার্থেই সৃষ্ট এবং সংগঠিত।

তৃতীয়তঃ স্বীকার করতে খুবই কষ্ট বোধ হয় বা সম্পূর্ণ উড়িয়েই দেওয়া হয় তা হল মানব সমাজের শিল্পী-অশিল্পী বা উত্তম-অধম এ দুই গোষ্ঠিতে বিভক্তিকরণেরও সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে পরিপূর্ণ ভাবে এক উন্নত সমাজ ব্যবস্থায়—কমিউনিস্ট সমাজে, যে ব্যবস্থায় থাকবে না একজন শিল্পী আর এক জন কারিগরের মধ্যে পার্থক্য। সেই সমাজ যখন গঠিত হবে, যখন বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার ও শ্রমজীবী জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের মধ্য দিয়ে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের পার্থক্য বিলুপ্ত হবে তখন একজন শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে পার্থক্যেরও অবসান ঘটবে—যে কারিগর সেই হবে শিল্পী। যে শিল্পী সেই হবে কারিগর। প্রতিটি মানুষই হবে শিল্পী, প্রতিটি মানুষই হবে সৌন্দর্যের নিয়মানুসারী।

বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় এই মূল প্রশ্নগুলি। গর্কী যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন সেই আক্ষেপের নিরসন অবশ্যই এ আলোচনার লক্ষ্য নয়।

বাস্তবে লক্ষ্য সেই আক্ষেপের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণতর আলোচনা ও গভীরতর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে অনস্বীকার্য।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ তাঁদের অত্যাশ্চর্য গবেষণা ও গ্রন্থরাজির মধ্যে এ বিষয়টিকে আদৌ উপেক্ষা করেন নি। বরং তাঁদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও দার্শনিক রচনার মধ্যে এ বিষয়টির বিভিন্ন মৌলিক দিকের উপর তীব্র আলোকপাত করেছিলেন। বিশেষ করে 'ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে শ্রমের প্রক্রিয়া এবং 'থিয়োরিজ অফ সারপ্লাজ ভ্যালু' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উৎপাদনশীল শ্রম ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের যে পার্থক্য মার্কস নির্দেশ করেছেন ও সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপলব্ধিতে অপরিসীম সহায়ক। বস্তুতঃ বিষয়টি সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা মার্কস অর্থনৈতিক তত্ত্ব সম্পর্কীত গবেষণামূলক তাঁর এ গ্রন্থ দুইটিতে যে ভাবে উত্থাপন করেছেন তা খুবই বিস্ময়জনক। মার্কস ও এঙ্গেলস্ তাঁদের অন্যান্য গ্রন্থরাজিতে বিষয়টির অন্যান্য দিকের প্রতিও যে আলোকপাত করেছেন— এই সমস্ত কিছুই বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার ভিত্তিভূমি।

বাস্তব জীবনের সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টিই ইতিহাসের চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি। রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশ ধারা অর্থনৈতিক বিকাশ ধারার উপরেই নির্ভরশীল। আবার এরা সকলেই পরস্পরের উপরে এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। তাই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত শ্রমজীবী জনগণের উপর পুঁজিবাদী ভাবাদর্শের যে প্রভাব, সেই প্রভাবকে কাটিয়ে উঠা এবং নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এ সংগ্রাম কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। বিশেষ করে যে শ্রমজীবী জনগণ আগামী দিনে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হবে সেই শ্রমজীবী জনগণের কাছে ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির প্রশ্নটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণকে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিঃস্ব করেনি, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাকে করে রেখেছে নিদারুণ ভাবে বঞ্চনাগ্রস্ত। তাই যে শ্রেণী হবে আগামী দিনের শাসকশ্রেণী তার ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করার যে প্রয়োজনীয়তা তাতে দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সেই সংগ্রামে এবং সেই সংগ্রামের

সাফল্যের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে যে সংস্কৃতি তাই হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি।

ধনতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণা রুদ্ধ, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক আকর্ষণ বিপরীত অনুপাতে নির্ধারিত, আর তাই মানুষের শিল্প সংস্কৃতি, মানুষের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির ইন্দ্রিয়গতরূপও নিদারুণভাবে ব্যাহত। ধনতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্টির এই অন্তর্নিহিত বিরোধ সৃষ্টির আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের চরম বেদনাদায়ক বৈশিষ্ট্য এটাই যে শ্রমিক যত বেশী সম্পদ সৃষ্টি করে তত বেশী সে নিঃস্ব হয়। শ্রমিক যত অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে ততই সে অধিক সস্তা পণ্যে পরিণত হয়। এভাবেই ধনতান্ত্রিক সমাজে বস্তুজগত যত বেশী মহার্ঘ হয় মানুষের জগতের তত বেশী অবমূল্যায়ন ঘটে। মানুষের জগতের এই ক্রম-অবমূল্যায়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামই জীবন-মুখী সংস্কৃতি বিকাশের সংগ্রাম, যার সার্থক পরিণতি ঘটে প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়েই। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটিও বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু তত্ত্বগত এই কোন আলোচনাই পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করে না যদি না তা কোন বিশেষ দেশের বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়। এখানে তাই ভারতীয় সমাজের প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। ভারতীয় সমাজের বর্তমান বিকাশের স্তরে মার্কসীয় বিশ্লেষণগুলির প্রয়োগ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এক নিরবচ্ছিন্ন ধারার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ভারতীয় সভ্যতা বর্তমানে যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তার সংঘাতশীল চরিত্র খুবই সুস্পষ্ট। ভারতীয় সমাজে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামন্তবাদের অবশিষ্টাংশের পাশাপাশি। একমাত্র নগর জীবনে পুঁজিবাদী ভাবধারার কিছুটা বিকাশ ঘটলেও ভারতের অধিকাংশ স্থান—গ্রামাঞ্চল সামন্তবাদী ভাবধারাতে এখনও সম্পৃক্ত। এর প্রভাব আবার নগর জীবনকেও করে তুলছে ভারাক্রান্ত। ফলে এক অদ্ভুত বৈপরিত্য—সামন্তবাদী ভাবধারার প্রাধান্য এবং পাশাপাশি ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরও প্রভাব ভারতীয় সমাজ-জীবনকে এক যন্ত্রণা-বিধুর স্তরে উপনীত করেছে। ফলে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনের অবমূল্যায়ন ঘটছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। এর মারাত্মক প্রভাব থেকে ভারতের আধুনিক শ্রমিক শ্রেণীও মুক্তি পাচ্ছে না। বরং বিপরীত ভাবে আধুনিক শিল্পের পুঁজিবাদী মালিকরাও যেমন করে একদিকে সামন্তবাদী ধ্যানধারণার বাহক আবার

তেমনি অপরদিকে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর উপরও প্রবলভাবে কার্যকর রয়েছে সামন্তবাদী কুপ্রভাব। এর সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে বিপ্লবী সংগ্রামের প্রবাহ হচ্ছে ব্যাহত।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই অতি সংকটজনক বিষয়টিকে উপেক্ষা করে বিপ্লবী পথে সার্থক ভাবে অগ্রসর হতে পারে না। পারে না যে তা বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়ে বারংবার প্রমাণিত হচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনে উন্নততর চেতনা সৃষ্টি এবং বিপ্লবী খাতে তার প্রবাহের জন্য এই প্রতিবন্ধকগুলির সঠিক বিশ্লেষণ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই প্রশ্নটি অবশ্যই অজানা কিছু নয়। কিন্তু জানা হলেও পরিস্থিতির একটা সার্বিক মূল্যায়ন প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে এই মূল্যায়নের একটা সূত্রপাত করা হয়েছে মাত্র। গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই বিষয়টির পূর্ণতর আলোচনায় অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শেষ কথা, একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্থনৈতিক সংগ্রামের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আদর্শগত ও নন্দনতাত্ত্বিক যে প্রশ্নগুলি প্রলেতারীয় সংগ্রামেখুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে সেই প্রশ্নগুলির উপর পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত একটা আলোচনার অবতারণা করা হল এই গ্রন্থে। আশা করা অন্যায় হবে না যে গভীরতর উপলব্ধি সঞ্জাত আরো বিভিন্নমুখীন আলোচনা সমগ্র বিষয়টিকে সমৃদ্ধতর করে তুলবে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিপ্লবী সংগ্রামে ভাবাদর্শ

রাষ্ট্রশক্তির প্রশ্নটি প্রতিটি বিপ্লবেরই প্রশ্ন। প্রত্যাশিত সমাজ বিপ্লব, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লব, তারও মূল প্রশ্ন রাষ্ট্রশক্তি। মানব-ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পরিবর্তে প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই বিপ্লবের মূল প্রশ্ন। 'দার্শনিকরা জগৎকে কেবল মাত্র বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আসল কথা একে **পরিবর্তন** করা।' [১] দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই মূল বৈশিষ্ট্যটির বাস্তব রূপায়ণ প্রলেতারীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সম্ভব।

প্রলেতারীয় রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গঠন শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জনগণের সমাজ-চেতনা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি এবং জনগণের চেতনা থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবশিষ্ট ভাবধারাগুলিকে বিদূরিত করার কাজগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র গঠন সম্পূর্ণতই অসম্ভব। তাই স্বাভাবিক ভাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমজীবী জনগণকে মাকর্সীয় বিশ্ববীক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামগ্রিকভাবে তাঁদের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন করা একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হিসাবে স্বীকৃত। এটা আরো জরুরী এই কারণে যে, যুগ যুগ ধরে শোষকশ্রেণীগুলি শ্রমজীবী জনগণকে আদর্শগতভাবে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এবং তাঁদের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-আহরণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকেই অবদমিত করার চেষ্টা করে চলেছে। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেরই একটি অবিচ্ছেদ্য ধারা। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধনের এই দায়িত্বই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্ম। এই কর্ম সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই উচ্চতর সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং কমিউনিষ্ট সমাজের নতুন মানুষ গড়ে ওঠে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিতের পরিবর্তন এ ভাবেই সমাজতান্ত্রিক উপরিসৌধেরও পরিবর্তন সাধন করে, পরিবর্তন নিয়ে আসে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডে।

সৃষ্টির প্রবাহ

'ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা অনুযায়ী বাস্তব জীবনের সৃষ্টি ও পুনঃ সৃষ্টিই ইতিহাসের চূড়ান্ত নিয়ামক উপাদান।'[২] এই গভীর সত্যোপলব্ধি থেকেই এঙ্গেলস্ আরো মন্তব্য করলেন, 'তাই যদি কেউ একে বিকৃত করে বলে যে অর্থনৈতিক উপাদানই হচ্ছে একমাত্র নিয়ামক শক্তি তা হলে তা হবে একটা অর্থহীন অসার এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য।'[৩] এঙ্গেলস্ আরো স্পষ্ট করে বললেন, 'অর্থনৈতিক অবস্থাটাই হচ্ছে ভিত্তি, কিন্তু উপরিসৌধের বিভিন্ন উপাদান—শ্রেণীসংগ্রামের রাজনৈতিক রূপসমূহ এবং তার ফলাফল, যথা: সফল সংগ্রামের পর বিজয়ী শ্রেণী কর্তৃক সংবিধান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, আইন-কানুন সংক্রান্ত বিবিধ বিধান, এবং এমনকি সংগ্রামে সামিল প্রতিটি মানুষের মননে এইসব বাস্তব সংগ্রামের প্রতিফলন; রাজনীতি, আইন, দার্শনিক তত্ত্ব ধর্মীয় মতামত এবং তারপর এইসবের কতকগুলি গোড়া তত্ত্বে পরিণতিলাভ—এই সবকিছুও ঐতিহাসিক সংগ্রামের গতির উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এরা সংগ্রামগুলির বাস্তবরূপ নিরূপণে প্রাধান্য লাভ করে।'[৪]

অর্থনীতিই একমাত্র নিয়ামক শক্তি বলে যে কোন কোন ক্ষেত্রে 'মার্কস'-বাদীরা' প্রচার করার চেষ্টা করে, এঙ্গেলস্ আত্মসমালোচনা করে সেই সম্পর্কে বললেন যে, 'তরুণরা যে কোন কোন সময় অর্থনৈতিক দিকটার প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত জোর দিচ্ছে তার জন্য অংশতঃ মার্কস এবং আমিই দায়ী। আমাদের শত্রুরা যারা এই মূলনীতিকে অস্বীকার করেছিল তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই নীতির উপর একটু বেশী জোর দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাছাড়া আমাদের এমন সময়, সুযোগ এবং স্থানও সবসময় ছিল না যে এই পারস্পরিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদানগুলিকে তাদের ঠিক যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।'[৫]

কি অপরিসীম আন্তরিকতার সঙ্গেই না এঙ্গেলস্ সমস্ত বক্তব্যটাকে উত্থাপন করেছেন!

বেশ দীর্ঘ হলেও আরো একটি উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

'(১) সমাজ ইতিহাসের নিয়ামক বনিয়াদ বলে [আমরা যে] সব অর্থনৈতিক অবস্থাকে গণ্য করি, তার দ্বারা আমরা বুঝি এমন সব পদ্ধতিকে যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সমাজের মানুষ তাদের জীবনধারণের উপকরণাদি উৎপাদন করে এবং (শ্রম বিভাগের অবস্থায়) নিজেদের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিনিময়

করে। অতএব উৎপাদন ও পরিবহণের সামগ্রিক কৃৎকৌশল এই অর্থনৈতিক অবস্থাগুলিরই অন্তর্ভুক্ত। আমরা মনে করি এই 'কৃৎকৌশলই' আবার বিনিময় পদ্ধতির নিয়ামক ; আর কেবল বিনিময় পদ্ধতিরই নয়, উৎপন্ন দ্রব্যাদির বণ্টন এবং সেই সঙ্গে গোষ্ঠীসমাজের অবসানের পর থেকে, শ্রেণীবিভাগ ও প্রভুদাস সম্পর্ক এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্র, রাজনীতি, আইন ইত্যাদিরও নিয়ামক। যে ভৌগোলিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি কাজ করে সেই ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক বিকাশধারার পূর্ব পূর্ব পর্যায়গুলির যে সব দায়ভাগ পর যুগে সঞ্চারিত হয়েছে এবং চিরাচরণ বা জড়ত্বের দরুন এখনও টিকে আছে সেই দায়ভাগ, এবং যে বাহ্যিক পরিবেশ সমাজের তৎকালীন রূপকে বেষ্টন করে আছে সেই পরিবেশ—এরাও অর্থনৈতিক অবস্থাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।...

'(২) আমরা অর্থনৈতিক অবস্থাবলীকেই শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক বিকাশ-ধারার নিয়ামক বলে মনে করি। অবশ্য নৃজাতিও তো একটা অর্থনৈতিক উপাদান। কিন্তু এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয় ঃ

'(ক) রাজনীতি, আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিকাশধারা অর্থনৈতিক বিকাশধারার উপরেই ভিত্তিশীল। কিন্তু এরা সকলেই পরস্পরের উপরে এবং সেই সংগে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরেও প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে। একথা ঠিক নয় যে অর্থনৈতিক অবস্থানই একমাত্র কারণ এবং একাই সক্রিয়, আর বাকী সব কিছুতেই রয়েছে কেবল নিষ্ক্রিয় প্রভাব। বরং বলা উচিত যে অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে, আর এই অর্থনৈতিক প্রয়োজনই শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।'[৬]

অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে ভিত্তি করে ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলে সেই সম্পর্কে এঙ্গেলস্ এখানে সুস্পষ্ট করেই বলেছেন।

বিকাশধারার এক পর্যায়ে প্রচলিত উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের সঙ্গে সমাজের উৎপাদন-শক্তিসমূহের সংঘাত উপস্থিত হয়। উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশের বিশেষ রূপ থেকে এই সম্পর্কসমূহ রূপান্তরিত হয় তাদের শৃঙ্খলে। এই সংঘাতের সমাধান কিরূপে সম্ভব ? মার্কসীয় বিশ্ব-বীক্ষা অনুযায়ী,

'... উৎপাদন-সম্পর্কসমূহের সামগ্রিক যোগফলই হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো—আসল বনিয়াদ ; এই বনিয়াদের উপরই গড়ে ওঠে আইনগত ও

রাজনীতিগত উপরি-কাঠামো ; এই বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমাজ-চেতনার বিশেষ রূপগুলি আকার নেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবন প্রক্রিয়াগুলি সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।'[৭]

উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ উৎপাদন-শক্তিসমূহের শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হওয়ায় ফলে শুরু হয় এক সমাজ বিপ্লবের যুগ। অর্থনৈতিক বনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবিপুল উপরিসৌধটি কম বেশী দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয়। 'এই সব রূপান্তরের পর্যালোচনাকালে দুটি বিষয়ের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য করতে হবে ; উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থাগুলির বৈষয়িক রূপসমূহ—প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতই যথাযথভাবে যা নির্ণয় করা সম্ভব, এবং আইন, রাজনীতি, ধর্ম, নন্দন বা দর্শনগত, সংক্ষেপে ভাবাদর্শগত রূপসমূহ—যার মধ্য থেকে মানুষ এই সংঘাত সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সেই সংঘাতের সমাধান করে।'[৮]

ধনতান্ত্রিক সমাজের গর্ভে যে উৎপাদন-শক্তিসমূহের বিকাশ ঘটেছে তারাই আবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্ববিরোধ সমাধানের বৈষয়িক অবস্থা সৃষ্টি করছে। মার্কসীয় সমাজ বিপ্লবের মূলসূত্র এখানেই নিহিত।

মার্কসীয় বিপ্লবী তত্ত্বের এই সুপরিচ্ছন্ন বিন্যাস থেকে যে দায়িত্বটি উপস্থিত হয় তা হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং জগৎকে পরিবর্তনের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালনা। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ব্যতিরেকে নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

নতুনের সৃষ্টি : বুর্জোয়া বিপ্লব ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের বৈসাদৃশ্য

ইতিহাসের শুরু থেকে পৃথিবীতে অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন হয়েছে এবং সামগ্রিক সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু এই রূপান্তর সমাজের অগ্রগতির সূচক হলেও এর অন্তঃস্থলে নিহিত রয়েছে শোষণ এবং একদিক দিয়ে বলতে গেলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের অবাধ অগ্রগতি সাধিত হলেও, এই বিপ্লবসমূহের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়েছে শোষণের প্রকারভেদ—রূপান্তরের মধ্য দিয়েও সমাজের শোষণমূলক চরিত্র থেকেছে অব্যাহত।

বুর্জোয়া বিপ্লব মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের অবসান ঘটিয়ে যে নতুন সমাজের সৃষ্টি করে, তাতেও বর্তমানের উপর আধিপত্য করে অতীত। কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লবোত্তর সমাজে বর্তমান আধিপত্য করে অতীতের উপর। ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যটিই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্পূর্ণতই মৌলিক। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজি হল স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তা, কিন্তু জীবন্ত মানুষ হল পরাধীন, স্বতন্ত্র সত্তাবিহীন। বুর্জোয়া সমাজে শিল্প, সংস্কৃতি তথা তামাম উপরিসৌধের মূল চরিত্র নির্ভরশীল এই আদর্শের উপরই।

তাই অতীতে যত বিপ্লবই ঘটে থাকুক না কেন এবং সেই বিপ্লব যে সামাজিক রূপকেই পরিস্ফুট করে তুলুক না কেন, তাতে যে চরিত্রটি অব্যাহত থেকেছে তা হল সমাজের এক অংশ কর্তৃক অপর অংশের শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে অতীত যুগের এবং বর্তমান ধনতান্ত্রিক জগতের সামাজিক চেতনায় যত বিভিন্নতা ও বিচিত্রতাই প্রকাশ পাক না কেন, তা কয়েকটি নির্দিষ্টরূপ বা সাধারণ ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। একমাত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রেণী-বিরোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির পূর্বে শোষণমূলক ধারণা পুরোপুরি অদৃশ্য হতে পারে না। প্রলেতারীয় বিপ্লব হল চিরাচরিত সম্পত্তি সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ; সুতরাং এই বিপ্লবের বিকাশে চিরাচরিত ধারণার সঙ্গেও একেবারে আমূল একটা বিচ্ছেদ নিহিত রয়েছে এবং ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে প্রলেতারীয় বিপ্লবের এটা একটা মৌলিক বৈসাদৃশ্য।

মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে, কিন্তু এই সৃষ্টি কেবলমাত্র তার ইচ্ছানুসারীই হয় না এবং তাদের নিজেদের পছন্দমত পরিস্থিতিতেও তা সম্ভব হয় না। অতীত থেকে প্রাপ্ত একটা বিশেষ ধরনের ঘটনা-সমাবেশের সঙ্গে সরাসরি মুখোমুখি হয়েই মানুষ এই নতুনের সৃষ্টি করে। 'অতীতের সমস্ত মৃত যুগগুলির ঐতিহ্য জীবিতদের মস্তিষ্কে রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে। এবং ঠিক যেই মুহূর্তে তারা নিজেদের এবং অন্য সমস্ত কিছুকে বৈপ্লবিক প্রবাহের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করে এবং অভূতপূর্ব কিছু সৃষ্টির চেষ্টা করে, ঠিক সেই বিপ্লবী সংকটের মুহূর্তগুলিতেই তারা ব্যস্ততার সঙ্গে অতীতের সমস্ত চরিত্রগুলিকে যেন মন্ত্রোৎসারিত করে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করে, তাদের নাম, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং রণধ্বনিগুলিকেও অনুকরণ করার চেষ্টা করে এবং এইভাবেই বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন দৃশ্যপটকে পরম্পরাগত বেশভূষায় এবং

অনুকৃত ভাষায় উপস্থিত করে।'[৯] নতুন সৃষ্টির মুহূর্তেও এই ভাবেই আবার পুরাতনকেও আঁকড়ে ধরা হয়, তার অনুকৃতি করা হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের এই হচ্ছে ট্র্যাজেডী।

কিন্তু 'উনবিংশ শতাব্দীর সমাজবিপ্লবের যে কাব্য তার উৎস অতীত হতে পারে না, সে উৎস হচ্ছে ভবিষ্যৎ। যতক্ষণ না সে তার অতীত-সম্পর্কিত সমস্ত কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারছে ততক্ষণ তার সূচনাও সম্ভব নয়। পূর্বতন সমস্ত বিপ্লবের ক্ষেত্রে অতীত বিশ্ব-ইতিহাসের অনুকৃতি প্রয়োজন হত এবং তা প্রয়োজন হত নিজেদের আধারকে আবৃত রাখবার জন্যই, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লব মৃতকে অবশ্যই সমাধিস্থ করবে। পূর্বে যেখানে বক্তব্য আধারকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল আজ সেখানে আধার বক্তব্যকে ছাপিয়ে যাবে।'[১০] নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে মার্কস বুর্জোয়া বিপ্লব ও প্রলেতারীর বিপ্লবের এই পার্থক্যটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

আরো, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবগুলির মত বুর্জোয়া বিপ্লব সাফল্যের পর সাফল্যে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলে, তাদের নাটকীয় পরিণতিগুলি পরস্পরকে ছাপিয়ে যায়, মানুষ এবং সবকিছুই যেন ঝলমলিয়ে ওঠে, আনন্দ-মত্ততাই হয়ে ওঠে দৈনন্দিন জীবনের ভাবানুষঙ্গ। কিন্তু এ সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী, অতি দ্রুতই এরা মধ্যাহ্ন গগনে পৌঁছায় এবং ঝড়-ঝঞ্ঝাকালীন সময় থেকে গাম্ভীর্যের সঙ্গে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বেই এই সমাজ এক দীর্ঘস্থায়ী হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। অপরদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবগুলির ন্যায় প্রলেতারীর বিপ্লব নিরবচ্ছিন্নভাবে আত্মসমালোচনা করে, নিজেদের প্রবাহে বারংবার থমকে দাঁড়ায়, আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু সংঘটিত হয়েছে সেখানেই ফিরে আসে, যাতে আবার নতুন করে শুরু করা যায়; তাদের প্রথম প্রচেষ্টাগুলির অপ্রতুলতা, দুর্বলতা এবং তুচ্ছতাগুলিকে নির্মমভাবে বিদ্রূপ করে, তাদের শত্রুকে তারা যেন ভূপাতিত করে, যাতে তারা পৃথিবী থেকে নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং সেই শত্রুদের সামনে নতুনভাবে জেগে উঠতে পারে আরো প্রচণ্ডতা নিয়ে, তাদের লক্ষ্য থেকে অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে বারংবার ফিরে আসতে পারে যতক্ষণ না সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখান থেকে আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় এবং সেই পরিস্থিতিটাই সজোরে ঘোষণা করে,

Here is the rose, here dance!'[১১]

বুর্জোয়া বিপ্লব ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের পার্থক্যকে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যকে মার্কস যে অপূর্ব সুষমায় প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন, এর মধ্যেই নিহিত নতুন সৃষ্টির রহস্য—যে নতুন পুরাতনের সমস্ত কুসংস্কারমুক্ত—যে নতুন এক ভিন্নতর উৎপাদন সম্পর্কের পরিবেশে সঞ্জীবিত। এই প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সম্ভব সেই সৃষ্টি যে সৃষ্টি পুরাতন পৃথিবীর বন্ধনমুক্ত—যে সৃষ্টি হল এক নতুন পৃথিবী—নতুন মানুষ। 'মানুষ, যে অবশেষে হয় নিজের সৃষ্ট সমাজসংগঠনের প্রভু, সে একই সঙ্গে উন্নীত হয় প্রকৃতিরও প্রভু হিসাবে—নিজেরও প্রভু—সম্পূর্ণ মুক্ত।'[১২]

নতুন সৃষ্টিতে ভাবাদর্শের সক্রিয়তা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সামাজিক অস্তিত্বকে সামাজিক চেতনার উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষের ভাবাদর্শকে সামাজিক অস্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল বলে মনে করে, কিন্তু আবার একই সঙ্গে সমাজের অগ্রগতিতে ভাবাদর্শের সক্রিয় ভূমিকাকেও স্বীকার করে। সমাজ-জীবনের যে কোন ক্ষেত্রেই মানুষ সর্বদা সচেতন ভাবে এবং লক্ষ্যপ্রবণ ভাবেই কাজ করে; ফলে তাদের চিন্তা, মনন ও তত্ত্ব জীবনের সর্বক্ষেত্রকে প্রভাবান্বিত ও সঞ্জীবিত করে তোলে। সামাজিক ধ্যান-ধারণাগুলির সক্রিয়তাই মানুষের পথ চলার দিক-নির্দেশ করে এবং তার কর্তব্য সাধনে উজ্জীবিত করে।

কিন্তু ভাবাদর্শ যেমন একদিকে সমাজের অগ্রগতি সাধন করে আবার অনুরূপভাবে সমাজকে পশ্চাদ্‌গামীও করে দিতে পারে। ভাবাদর্শ কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করবে তা নির্ভর করে কোন্ শ্রেণী সেই ভাবাদর্শ প্রচার করে—নির্ভর করে সেই ভাবাদর্শ প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল এবং তা সমাজ-জীবনের বাস্তব তাগিদকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে কি করে না এবং তা জনগণের স্বার্থকে কতটা সুরক্ষিত করে তার উপর।

যে ভাবাদর্শ সমাজের সর্বাপেক্ষা অগ্রসর শ্রেণীসমূহ—শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে প্রতিফলিত করে এবং পুরাতন সমাজব্যবস্থার অবসানে এবং নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে, একমাত্র সেই ভাবাদর্শই সমাজের প্রগতিতে গুরুত্বের অধিকারী।

কিন্তু মূল প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, ভাবাদর্শ যতই নতুন ও প্রগতিশীল হোক না না কেন, একমাত্র সেই প্রগতিশীলতার দ্বারাই পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে

দিতে এবং নতুন সমাজব্যবস্থা স্থাপনে তা সমর্থ হয় না। ভাবাদর্শ একমাত্র তখনই একটা সক্রিয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যখন তা জনগণের মনকে আকৃষ্ট করতে পারে, জনগণের মনের গহনে তা প্রবেশ করতে পারে। এই প্রগতিশীল ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ জনগণই একটা সামাজিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে, যে শক্তি মানবজীবনের বস্তুগত ও আত্মিক সমস্যাগুলির সমাধান করতে সক্ষম।

প্রতিপাদ্য বিষয়ের স্বচ্ছ উপলব্ধির জন্য এই ভাবাদর্শের প্রধান প্রধান দিকগুলির কিছু আলোচনা প্রয়োজন, যথা ঃ

রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ

মার্কসীয় চিন্তা অনুযায়ী রাজনৈতিক সম্পর্ক হচ্ছে 'সর্বোপরি শ্রেণীসমূহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্ষমতার জন্য এবং সমাজে আধিপত্যের জন্য শ্রেণীসমূহের লড়াই। বিভিন্ন রাষ্ট্র বা জাতিগুলির সম্পর্কও রাজনীতিগত। শ্রেণী, শ্রেণী-সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনীতিরও আবির্ভাব।

রাজনীতির সঙ্গেই জনগণের রাজনৈতিক ধারণা ও মতাদর্শসমূহ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক ধারণাসমূহ শ্রেণী, জাতি এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ককেই প্রতিফলিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে। শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লব ; সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ; রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে কোন শ্রেণীর মতামতের দর্শনই হচ্ছে রাজনৈতিক আদর্শ। শ্রেণীগুলির পারস্পরিক সংগ্রাম, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কার্যাবলীর মাধ্যমেই এই রাজনৈতিক মতাদর্শ সরাসরিভাবে প্রযুক্ত হয়।

কোন রাষ্ট্রের সংবিধান ও কর্মকাণ্ড, বা কোন রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচী, অথবা কোন তত্ত্বগত বা অন্যপ্রকারের দলিল এই রাজনৈতিক মতাদর্শেরই প্রতিফলন। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের চরিত্র নির্ভর করে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থকে তা প্রতিফলিত করে তার উপর।

সমাজচেতনায় অন্যান্য সমস্ত রূপের মধ্যে রাজনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শই অর্থনৈতিক ভিতের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক ধারণাসমূহই সমাজবিকাশের সমগ্র গতিকে

নির্দিষ্ট ও পরিচালিত করে। এই রাজনৈতিক ধারণাসমূহ সমাজচেতনার অন্যান্য রূপ—আইন, নৈতিকতা, শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে, সমাজ তাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীতে সিঞ্চিত করে এবং একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত করে।

আইন ও আইনগত আদর্শ

প্রতিটি সমাজই আবদ্ধ থাকে একটি আইনগত সম্পর্কে। একটা বিশেষ সমাজের মানুষদের আচরণের বাধ্যতামূলক মানদণ্ড ও নিয়মের সমষ্টিই হচ্ছে আইন। রাজনীতির অনুরূপ আইনেরও উৎপত্তি শ্রেণী ও রাষ্ট্রের সঙ্গে। আইন শাসকশ্রেণীর ইচ্ছাকেই আইনগত কাঠামোর মধ্য দিয়ে বিকশিত করে এবং শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করে।

সংঘাতশীল শ্রেণী-সমাজে আইন বিবিধরূপে বিকশিত হয়েছে —দাস-সমাজ, সামন্তসমাজ ও ধনতান্ত্রিক সমাজের আইন শোষিতশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীর স্বার্থকে রক্ষা করেছে। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেই আইন রক্ষা করে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থকে। তাই শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে আইনগত আদর্শেরও থাকে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী চরিত্র এবং শাসকশ্রেণী অন্যান্য শ্রেণী-সমূহের উপরে যেমন নিজের ইচ্ছাকে রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে চাপিয়ে দেয়,তেমনি তা চাপিয়ে দেয় আইনগত আদর্শের মধ্য দিয়েও। কিন্তু তা করার সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণী আইনের শ্রেণীচরিত্র ঢেকে রাখারও চেষ্টা করে, আর এই আইনকেই জনগণের আইন, ন্যায়বিচার ও মূল্যবোধের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বা আইনের চোখে সকলেই সমান বলে প্রচার করার চেষ্টা করে।

নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ

সমাজবদ্ধ মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, মান-অপমান ইত্যাদি ধ্যান-ধারণাসমন্বিত আচার-আচরণের নীতি ও মানদণ্ডই হচ্ছে নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ। আইনের মত নৈতিক মূল্যবোধ কোন লিখিত বিধি-বিধান নয়। কিন্তু এই মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রিত হয় জনগণের মতামত, রীতিনীতি, অভ্যাস, শিক্ষা এবং বিশ্বাসের দ্বারা। এই নৈতিকতার দ্বারাই নির্ধারিত হয় মানুষের সঙ্গে পরিবার, সমাজ, অন্য জাতি এং সাধারণ জনগণের সম্পর্ক।

মানবসমাজের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হয় নৈতিক মূল্যবোধেরও। এই

নৈতিক মানদণ্ড হচ্ছে মানুষের প্রতি সমাজের দাবী। কিন্তু এই মানদণ্ড শাশ্বত কিছু নয়। উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের পরিবর্তন সমাজে যে পরিবর্তন নিয়ে আসে, তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় নৈতিক মানদণ্ডেরও। আদিম সমাজব্যবস্থায় নৈতিক মানদণ্ড সেই সমাজের সকল মানুষের জন্যই সমান ছিল। কিন্তু শ্রেণীসমূহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই মানদণ্ড এক শ্রেণী বা আরেক শ্রেণীর স্বার্থকেই প্রতিফলিত করতে শুরু করল। নৈতিক মানদণ্ডও হয়ে উঠল শ্রেণীচরিত্রসমন্বিত। তাই সংঘাতশীল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে যেমন থাকে শোষক শ্রেণীর নৈতিকতা, তেমনি থাকে শোষিত শ্রেণীর নৈতিকতা, যদিও সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে প্রথমটিই। ক্রীতদাস প্রথায় দাস মালিক-দের নৈতিকতারই ছিল প্রাধান্য, তেমনি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রাধান্য ছিল সামন্ত প্রভুদের নৈতিকতার এবং বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে প্রভুত্ব করে চলছে পুঁজিপতিদের নৈতিকতা। আর এর বিপরীত ছিল দাসসমাজে ক্রীতদাসদের এবং সামন্ত সমাজে ভূমিদাসদের নৈতিক মানদণ্ড, যেমন বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে আছে সর্বহারাদের নৈতিকতা।

নৈতিক মূল্যবোধ তাই শ্রেণীচরিত্র-বিবর্জিত নয়। উপরিসৌধের একটি উপাদান হিসাবে নৈতিক মূল্যবোধ সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রকেই করে প্রভাবান্বিত। অর্থনীতি ও রাজনীতির উপরও থাকে এর প্রভাব। ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র মনে করা হয়, ঠিক বিপরীতভাবে তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ঘটিয়ে কাজের অধিকারকেই পবিত্র মনে করা হয়।

বর্তমান পৃথিবীতে বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও কমিউনিস্ট মূল্যবোধ পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। চরম স্বার্থান্ধতাই বুর্জোয়া মূল্যবোধ। 'মানুষের সঙ্গে মানুষের নেকড়ের সম্পর্ক'—এটাই হচ্ছে বুর্জোয়া নৈতিকতার মানদণ্ড। অপর পক্ষে কমিউনিস্ট নৈতিকতা শ্রমজীবী জনগণের আদর্শ ও স্বার্থকেই প্রতিবিম্বিত করে। লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থের নিরিখেই বিবেচ্য কমিউনিস্ট নৈতিকতা। সাম্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত করাই এর লক্ষ্য। তাই কমিউনিস্ট নৈতিকতা ঘৃণা করে লোভ, শোষণ, শঠতা ও বঞ্চনাকে ; আর শ্রদ্ধা করে সাহস, সরলতা, সততা, সমতা, আত্মত্যাগ ও শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসাকে।

ধর্ম

'ধর্ম হচ্ছে নিপীড়িত জীবের দীর্ঘশ্বাস, একটা হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়··· এটা হচ্ছে জনগণের আফিম।'[১৩]

শোষক শ্রেণীর তাত্ত্বিকরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ধর্মীয় অনুভূতি প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষের মনের মধ্যে নিহিত। কিন্তু বাস্তবে সমাজ-বিকাশের একটা বিশেষ স্তরেই ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল। ধর্মের ইতিহাস সন্ধান করলে এই সূত্রই পাওয়া যায় যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর প্রকৃত উৎস সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতাই ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎপত্তির কারণ। প্রকৃতির ভয়াল এবং স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ও সামাজিক নির্যাতনের প্রকৃত কারণগুলি মানুষ যখন উপলব্ধি করতে পারেনি, তখনই মানুষের মনে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস জন্মায়। মানুষের মননে বাস্তবের বিকৃত ও কল্পনাশ্রয়ী প্রতিফলনই ধর্ম।

প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষ যখন সম্পূর্ণতই নির্ভরশীল ছিল, সমাজ-বিকাশের সেই যুগে মানুষ এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর আরোপ করেছিল এক একটা অলৌকিক গুণ, আর তাদের রোষের কবল থেকে রেহাই পাবার আকাঙ্ক্ষায় তাদের দেব-দেবী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব বা দেবদূত আখ্যা দিয়ে পূজা, প্রার্থনা, প্রাণী-উৎসর্গ ইত্যাদি নানারূপ ধর্মীয় আচার-আচরণের আশ্রয় নেয়। আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল পুরোহিত, ওঝা ইত্যাদি সমাজের এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির।

সমাজে শ্রেণীসমূহ ও শোষণের উদ্ভব মানুষকে সামাজিক শক্তির চাপের কাছে একেবারে অসহায় করে ফেলেছিল, যেমন অসহায় বোধ করেছিল আদিম মানবরা অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিক শক্তির সম্মুখে। শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শোষিতদের এই অসহায়তা সৃষ্টি করল পরপারের কল্পনা, যে পর-পারেই একমাত্র সম্ভব একটু ভাল ভাবে জীবন যাপন করা। শোষণমূলক সমাজের নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভের আশায় শ্রমজীবী মানুষ তাই গ্রহণ করল ধর্মের আশ্রয়।

ধর্ম তাই প্রতিক্রিয়াশীল—বিজ্ঞানবিরোধী। ধর্ম তাই শ্রমজীবী জনগণকে নির্বিঘ্নে শোষণ করা, আদর্শগতভাবে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য শোষক শ্রেণীর কাছে এক অমোঘ হাতিয়ার। উপরিসৌধের একটি উপাদান হিসাবে ধর্ম শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করা এবং শোষণমূলক ব্যবস্থাটাকে দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। তাই 'জনগণের সুখ-শান্তির

মায়াজাল এই ধর্মের অবসান ঘটানোর অর্থ জনগণের প্রকৃত সুখ-শান্তির দাবী করা। কোন পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্তি দূর করার অর্থ, যে পরিস্থিতি সেই ভ্রান্তির উদ্ভব ঘটায় তার অবসান ঘটানো। ধর্মের সমালোচনার অর্থ তাই, যে উৎস থেকে অশ্রুর উদ্ভব অন্তর্নিহিত ভাবে তারই সমালোচনা। ধর্ম এই উৎসেরই মহিমা।'[১৪]

বিজ্ঞান

সক্রিয় কর্মই বিজ্ঞানের উৎস এবং অগ্রগতির ভিত্তি। বস্তুগত উৎপাদনের চাহিদাই বিজ্ঞানের মূল চালিকা শক্তি। এঙ্গেলস্ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে,'সমাজের যদি কোন কারিগরী চাহিদা থাকে তবে তা বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে দশটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অধিকতর সাহায্য করে। বিজ্ঞান জগৎকে কতকগুলি প্রতীতি, বিভিন্ন গুণধর্মী বস্তুসমূহ এবং নিয়মের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করে, কিন্তু এর সঠিকতা ও সত্যতা প্রমাণিত করতে হয় কার্যকরী অভিজ্ঞতা দিয়েই। সুদূর অতীতে আদিম সমাজেই মানুষ জীবন-ধারণের সামগ্রী সংগ্রহের তাগিদে প্রকৃতির শক্তি সমূহের সংস্পর্শে আসে এবং কতকগুলি অতি প্রাথমিক এবং স্থূল ধ্যান-ধারণা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই ধ্যান-ধারণাগুলি ছিল নিতান্তই প্রাথমিক এবং এতে বিজ্ঞানের কোন চরিত্র ছিল না। সমাজ-চেতনার একটা বিশেষ অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে দাস-সমাজে। দাস-সমাজে মানসিক শ্রমকে কায়িক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং এর ফলে এক বিশেষ ধরনের মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের কাজ ছিল জ্ঞান-চর্চা করা।

বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার নিরবচ্ছিন্নতাই বিজ্ঞানের একটা অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। নতুন সমাজে, নতুন পুরুষরা পূর্বতন বৈজ্ঞানিক সাফল্যকে অগ্রাহ্য না করে, তাকেই নতুন দিনের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বিকশিত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকাংশেই সমাজব্যবস্থা এবং সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিকাশ এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্যসমূহকে প্রয়োগের লক্ষ্য নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার চরিত্রের উপর। পুঁজিপতিদের নিকট বিজ্ঞান হচ্ছে একদিকে প্রতিযোগীদের পরাস্ত করা এবং অপরদিকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের যন্ত্র। সেইজন্যই পুঁজিবাদী সমাজ

বিজ্ঞানের যে ক্ষেত্রকে অধিকতর মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা যায়, সেই সেই ক্ষেত্রের বিকাশের জন্যই প্রধানতঃ চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের শিল্পই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা লাভজনক এবং তাই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সমরাস্ত্র নির্মাণ এবং আণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু এবং অন্যান্য পদ্ধতির যুদ্ধ কৌশল উদ্ভাবন করবার জন্যই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে। এককথায় বুর্জোয়া সমাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয় এই শোষণ-মূলক সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা এবং তার পচনশীল দেহে কিছুটা কৃত্রিম উজ্জ্বলতা সৃষ্টির জন্যই। আর তার সঙ্গে চালানো হয় প্রগতি ও সাম্যবাদের উপর এক হিংস্র আক্রমণ। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্যে, মানবসমাজের বৈষয়িক, আত্মিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য।

শিল্পকলা

মানব-চেতনায় সৌন্দর্যময় ভাবমূর্তিতে বাস্তবের প্রতিফলনের একটা বিশিষ্ট রূপই হচ্ছে শিল্পকলা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনা এবং শিল্প-কর্মে তদসমুদয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিবিম্বিত রূপ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে কাব্য, উপন্যাস,, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য এবং এমনকি আধুনিক সিনেমা।

শিল্পকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে এর এটাই বৈপরীত্য যে, শিল্পকলায় বাস্তবের প্রতিফলন ধারণা বা প্রতীতির মধ্য দিয়ে ঘটে না, ঘটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশিষ্ট রূপ তথা সৌন্দর্যময় প্রতিমূর্তির মধ্য দিয়েই।

মানবসমাজের ঊষালগ্নেই শিল্পকলার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং এর উদ্ভব হয়েছিল শ্রমের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। প্রারম্ভিকভাবে শিল্পকলা শ্রমের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। সেই সম্পর্ক, পরোক্ষ ভাবে হলেও আজও বিদ্যমান।

শ্রেণী-সমাজে শিল্পকলাও শ্রেণীচরিত্রসমন্বিতই থাকে। তাই উপরি-সৌধের একটি অঙ্গ হিসাবে যে ভিতের উপর এর সৃষ্টি, সেই ভিতকে রক্ষা এবং বিকাশের জন্যই শিল্পকলা ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন শ্রেণী তাই শিল্পকলাকে তাদের রাজনৈতিক, নৈতিক এবং অন্যান্য ধ্যান-ধারণার বাহন রূপেই প্রয়োগের চেষ্টা করে। বুর্জোয়া শিল্পকলা বুর্জোয়া সমাজের ধনতান্ত্রিক ভিতকেই সেবা করবার জন্য ব্যবহৃত হয়, ব্যবহৃত হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং শোষণের

ভিতকে জীইয়ে রাখা এবং তার সার্থকতা সপ্রমাণের জন্য, ব্যবহৃত হয় বিপ্লবী-শক্তিকে প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাবকে বিলম্বিত করবার জন্য।

ভাবাদর্শের এই বিশেষ বিশেষ দিকগুলির চরিত্রই বিশেষ একটি সমাজ-ব্যবস্থার সামগ্রিক ভাবাদর্শ বা উপরিসৌধের চরিত্র প্রতিফলিত করে। কিন্তু এই উপরিসৌধের বিকাশও একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংঘটিত হয়।

ভিত ও উপরিসৌধঃ পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও বিকাশের ধারা

বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ বস্তুগত উৎপাদন-সম্পর্ককেই প্রধান এবং চূড়ান্ত নিয়ামক বলে গ্রহণ করে। এই উৎপাদন-সম্পর্কের সামগ্রিকতাই হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, এর বনিয়াদ। এই বনিয়াদ কি ধরনের হবে তা আবার নির্ভর করে উৎপাদন-শক্তির প্রকৃতির উপর। প্রয়োজনীয় বাস্তব পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনীয় উৎপাদন-শক্তি ব্যতিরেকে কোন নতুন বনিয়াদই গড়ে উঠতে পারে না।

যে রাজনৈতিক, আইনগত, দার্শনিক, নৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক বা ধর্মীয় উপরিসৌধের প্রকৃতি ইতিপূর্বে আলোচিত হল তা সবকিছুই নির্ভর করে এই বনিয়াদের উপর। এটাও প্রতীয়মান যে এই উপরিসৌধও সমাজ-বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ বনিয়াদ ও উপরিসৌধ পারস্পরিক ক্রিয়াশীল এবং এই ক্রিয়া সমাজ বিকাশের চালিকা শক্তি।

সমাজ-বিপ্লব যখন একটা বিশেষ অর্থনৈতিক বনিয়াদকে অতিক্রম ক'রে ভিন্নতর একটা অর্থনৈতিক বনিয়াদের প্রতিষ্ঠা করে, তখন উপরিসৌধের পরিবর্তনও গভীরতর হয়ে ওঠে। বিপ্লব পুরাতন শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসনের পরিবর্তে নতুন একটা শ্রেণীর রাজনৈতিক শাসন স্থাপন করে। পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিবর্তে একটা নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রের সৃষ্টি হয়, সমাজ-চেতনার পরিবর্তন ঘটে, পুরাতন ভাবাদর্শকে হটিয়ে নতুন বনিয়াদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুনতর ভাবাদর্শ সৃষ্টি হয়। এই পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করেই লেনিন বলেছেন, 'কোন বিপ্লবের পরিব্যাপ্তিকালে পুরাতন উপরিসৌধ ভেঙে পড়ে এবং সকলের দৃষ্টির সম্মুখে বৈচিত্র্যময় সামাজিক শক্তিগুলির স্বতন্ত্র ক্রিয়া-কলাপের ফলে একটা নতুন উপরিসৌধের সৃষ্টি হয় এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত চরিত্র উদঘাটিত হয়।'[১৫]

কিন্তু এই পরিবর্তনেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। নতুন বনিয়াদ যে উপরিসৌধের সৃষ্টি করে তারও একটা আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য থাকে। বিকাশের নিরবচ্ছিন্নতাই এই স্বাতন্ত্র্যের বহিঃপ্রকাশ। পুরাতন বনিয়াদকে স্থানচ্যুত ক'রে নতুন বনিয়াদের সৃষ্টি এবং তারই অনুষঙ্গ হিসাবে উপরিসৌধের বিপ্লবের অর্থ এই নয় যে, পুরাতন উপরিসৌধের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিরই একই সঙ্গে বিলোপ সাধন ঘটবে। পুরাতন বনিয়াদকে ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে ঐ বনিয়াদের উপর সৃষ্ট সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি অকার্যকর হয়ে পড়ে। কিন্তু এর কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দিক বনিয়াদকে অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে এবং নতুন বনিয়াদকে সঞ্জীবিত করে এবং নতুন সমাজের নতুন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। আবার উপরিসৌধের এমন কতকগুলি দিকও থাকে যেগুলি পরিবর্তনশীল বনিয়াদের মতই বিলীয়মান নয়। মানবজাতির প্রগতির ইতিহাসে উপরিসৌধের এই দিকগুলি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সাধারণ নৈতিক মানদণ্ড, শিল্প-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিগুলি এইভাবেই বনিয়াদকে অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে।

এই নিরবচ্ছিন্নতার জন্যই প্রতি সমাজের উপরিসৌধের প্রকৃতিও হয় জটিল। যে কোন বিশেষ সমাজের উপরিসৌধে পরিত্যক্ত বনিয়াদের অনেক ধ্যান-ধারণা এবং আচার ব্যবহারও যেমন বজায় থাকে, তেমনি তাতে সংমিশ্রিত হয় নতুন বনিয়াদের উপর গড়ে ওঠা নতুন ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহারসমূহ। এরই সঙ্গে উপরিসৌধের আপেক্ষিক স্বতন্ত্রতা নিজস্ব বনিয়াদের বিকাশের ক্ষেত্রে পালন করে এক সক্রিয় ভূমিকা। সংঘাতশীল শ্রেণী-সমাজের ধ্যান-ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠান বনিয়াদকে সুরক্ষিত এবং সুদৃঢ় করে তোলে।

রাষ্ট্র, সমাজ, বনিয়াদ ও উপরিসৌধের এই পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই বিবেচ্য শ্রম ও সংস্কৃতি এবং বৈপ্লবিক বিকাশের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সংগ্রামের ভূমিকাটি।

১। মার্কস, ফয়েরবাখ এ্যাণ্ড দি এণ্ড অফ ক্লাসিক্যাল জার্মান ফিলজফি, মার্কস-এঙ্গেলস্ সিলেকটড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭।

২। এঙ্গেলস্, লেটার টু জে. ব্লক, সিলেকেটড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।

৩। ঐ

৪। এঙ্গেলস্, লেটার টু জে. ব্লক, সিলেকেটড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৩।

৫। ঐ

৬। এঙ্গেলস্, লেটার টু এইস, স্টার্কেনবুর্গ, সিলেকেটড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৭—৫৮।

৭। মার্কস, এ কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, সিলেকটেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩২৯।

৮। ঐ পৃঃ ৩২৯—৩০।

৯। মার্কস, দি এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অফ লুই বোনাপার্টি, সিলেকটেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২৫।

১০। ঐ, পৃঃ ২২৭।

১১। ঐ, পৃঃ ২২৮।

১২। মার্কস, সোসিয়ালিজম ; ইউটোপিয়ান এণ্ড সাইণ্টিফিক, সিলেকটেড ওয়ার্কস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪২।

১৩। মার্কস, কনট্রিবিউশন টু ক্রিটিক অফ হেগেলস্ ফিলজফি অফ ল, অন রিলিজিয়ন, পৃঃ ৩৯।

১৪। ঐ

১৫। লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, নবম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রম ও সংস্কৃতি

মানুষের হাতে পাথর থেকে প্রথম ছুরিখানা তৈরী হবার পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এক দীর্ঘযুগ, যার তুলনায় বর্তমান ঐতিহাসিক যুগ সময়ের পরিমাপে একান্তই তুচ্ছ। বানর থেকে মানুষে উত্তরণের হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে যখন 'হাত হল মুক্ত,' তখন থেকে বেড়ে চলল সেই হাতের সৌকর্য, তার নৈপুণ্য ; আর এইভাবে অর্জিত উন্নততর নমনীয়তা সঞ্চারিত হল বংশ পরম্পরায়, বৃদ্ধি পেল উত্তরোত্তর। 'এই নৈপুণ্য প্রয়োগের ফলেই মানুষের হাত হয়েছে এত নিখুঁত যে, সে সৃষ্টি করতে পেরেছে র‍্যাফেলের চিত্রকলা, থরওয়ালসনের ভাস্কর্য, আর প্যাগনিনির সঙ্গীত।'[১]

কিন্তু মানুষ সৃষ্টি করে কেন? 'প্রথমতঃ শ্রম, প্রাণবন্ততা, উৎপাদনশীল জীবন নিজেই মানুষের কাছে কেবলমাত্র একটা প্রয়োজন মিটাবার উপায়—দৈহিক অস্তিত্বকে বজায় রাখার প্রয়োজন হিসাবেই উপস্থিত হয়। তথাপি উৎপাদনশীল অস্তিত্বই হচ্ছে প্রজাতির অস্তিত্ব। এটা হচ্ছে জীবন-সঞ্চারী জীবন। ......জীবন নিজেই জীবন সৃষ্টির উপায় হিসাবে আবির্ভূত হয়।'[২]

অর্থাৎ মানুষ স্বভাবজাত ভাবেই সৃষ্টিশীল। মানুষের শ্রম জীবন-সঞ্চারী। মানুষের প্রাণবন্ততার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় নতুন জীবন—নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় থাকে মানব-প্রজাতির। মানুষের এই প্রাণবন্ততা মানুষের সচেতন কর্ম। এই সচেতন প্রাণবন্ততাই মানুষের সঙ্গে জন্তুর প্রাণবন্ততার পার্থক্যকে নির্দেশ করে। 'বস্তুতঃ জীবজন্তুও উৎপাদন করে। মৌমাছি, বীবর, পিঁপড়ে, প্রভৃতির মত তারা বাসা বাঁধে, বাসস্থান তৈরি করে। কিন্তু তারা উৎপাদন করে তাদের নিজেদের বা সন্তানদের আশু প্রয়োজন মেটানোর জন্য ; তারা উৎপাদন করে একদেশদর্শীভাবে ; তারা উৎপাদন করে কেবলমাত্র আশু দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে, কিন্তু মানুষ দৈহিক প্রয়োজন থেকে নিরপেক্ষ-ভাবেও উৎপাদন করে এবং এই প্রয়োজন থেকে মুক্ত হয়েই সে সত্যিকারের উৎপাদন করে। জীবজন্তুরা উৎপাদন করে কেবল নিজেদেরকে, কিন্তু মানুষ পুনরুৎপাদন করে সমগ্র প্রকৃতিকে। জীবজন্তুর উৎপন্ন প্রত্যক্ষভাবে তাদের নিজেদের দৈহিক সত্তারই অন্তর্গত, কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে তার

উৎপন্নের সম্মুখীন হয়। নিজেদের প্রজাতির পরিমাপ ও প্রয়োজন অনুসারেই জীবজন্তু সৃষ্টি করে ; কিন্তু প্রত্যেক প্রজাতির পরিমাপ অনুসারেই মানুষ সৃষ্টি করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টির অন্তর্নিহিত পরিমাপটিকে সর্বত্র সঞ্চারিত করতে পারে। সুতরাং সৌন্দর্যের নিয়মাবলী অনুসারেও মানুষ সৃষ্টি করে।'[৩]

মানবিক চাহিদা ও সৃষ্টিধর্মী মানুষ

মানুষ তাই শুধুমাত্র একটি সক্রিয় অস্তিত্ব নয়, তার এই সক্রিয়তাও সচেতন কর্ম। মানুষ তার প্রাণবন্ততা দিয়ে সৃষ্টি করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, কারণ এই বস্তুর মধ্য দিয়েই সে নিজে হয় প্রতিষ্ঠিত—কারণ অন্তস্তলে সে-ই প্রকৃতি। মানুষের এই সৃষ্ট বস্তু তার বস্তুগত ক্রিয়াকলাপকেই সপ্রমাণিত করে, সঙ্গে সঙ্গে তার সক্রিয়তাকেও প্রতিষ্ঠিত করে একটা বস্তুগত ও প্রাকৃতিক সত্তার কর্ম-তৎপরতা হিসাবে। মার্কসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী,

'মানুষ হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে একটি প্রাকৃতিক সত্তা। প্রাকৃতিক সত্তা এবং একটা জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্তা হিসাবে একদিকে সে জীবনের প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী—সে একটি সক্রিয় প্রাকৃতিক সত্তা। এই শক্তিগুলি তার মধ্যে বিরাজ করে প্রবণতা, ক্ষমতা—প্রেরণারূপে। অপরদিকে একটা প্রাকৃতিক, ভৌতিক, ইন্দ্রিয়গত বাস্তব সত্তারূপে সে জন্তু, উদ্ভিদের মতই একটা অধীন, শর্তাবদ্ধ এবং সীমিত প্রাণী। অর্থাৎ, তার প্রেরণার লক্ষ্যবস্তু সমূহ তার বহিঃস্থ, তার অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ; তদসত্ত্বেও এই বস্তুগুলি তার চাহিদার লক্ষ্যবস্তু —প্রয়োজনীয় বস্তু—তার সত্তার শক্তির বহিঃপ্রকাশ ও নিশ্চিত প্রমাণের পক্ষে অপরিহার্য। মানুষকে ভৌতিক, জীবন্ত, বাস্তব, ইন্দ্রিয়গোচর প্রাকৃতিক প্রাণশক্তি সম্পন্ন বস্তুগত সত্তা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে তার সত্তা ও জীবনের লক্ষ্য হিসাবে সে একটা বাস্তব, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর অধিকারী অথবা সে তার জীবনকে কেবল একটা বাস্তব ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর মধ্য দিয়েই প্রকাশ করতে পারে। বাস্তব, প্রাকৃতিক এবং ইন্দ্রিয়গোচর হওয়া এবং একই সঙ্গে নিজের বহিঃস্থ লক্ষ্য, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারী হওয়া অথবা তৃতীয় পক্ষের কাছে নিজেই লক্ষ্য, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিরূপে বিরাজিত হওয়া—সব কিছুই এক ও অভিন্ন।'[৪]

মার্কস তার প্রতিপাদ্যকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল করে তুলেছেন একটি উদাহরণ দিয়ে। তিনি বলছেন, 'উদ্ভিদ যেমন সূর্যের লক্ষ্যবস্তু, সূর্যের জীবন-সঞ্চারী

ও বস্তুগত বিশিষ্ট ক্ষমতার লক্ষ্যবস্তু, তেমনি আবার সূর্য উদ্ভিদের লক্ষ্যবস্তু—তার জীবনের প্রতিপাদনকারী একটা অপরিহার্য লক্ষ্যবস্তু।'[৫]

মানুষ এবং প্রকৃতি, মানুষ এবং তার কর্ম ও লক্ষ্যবস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। যতক্ষণ আমার একটা লক্ষ্যবস্তু আছে ততক্ষণ সেই লক্ষ্যবস্তুটিরও লক্ষ্য হিসাবে আমি আছি। ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ার অর্থ ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্যবস্তু হওয়া। আরও সুন্দরভাবে বলা যায়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ার অর্থ অন্যের কর্মের অধীন হওয়া। আরো বলা যায়, যেহেতু মানুষ একটা বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা তাই সে একটা অধীন সত্তাও বটে। বিশেষ করে মানুষ তার অধীনতাকে (অন্যের কর্মের অধীনতা) অনুভব করতে সক্ষম, তাই সে 'একটি আবেগপ্রবণ সত্তা'। 'আবেগ হচ্ছে মানুষের এমন একটা সারভূত শক্তি যা তেজোময়তার সঙ্গে তার লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখী।'[৬]

মানুষের সৃষ্টিধর্মিতার এই দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই বিবেচ্য মানুষের সমস্ত সৃষ্ট বস্তু।

প্রকৃতি ও শ্রমের প্রক্রিয়া

মানুষ সৃষ্টিধর্মী। কিন্তু শ্রমের প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে মানুষ এবং প্রকৃতি দুই-ই। এই প্রক্রিয়ায় মানুষ আপন প্রবণতার বশেই নিজের এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত পারস্পরিক বস্তুগত প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে, তাকে নিয়ন্ত্রিত এবং সীমিত করে। শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রকৃতির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। মানুষের দেহের স্বাভাবিক শক্তিগুলি—তার হাত-পা, মাথা ইত্যাদি হয়ে উঠে কর্ম-চঞ্চল এবং এভাবেই মানুষ আপন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতির সম্পদকে আহরণ করে। বহির্জগতের উপর এই শ্রমের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানুষ বহির্জগতকে পরিবর্তন করে। আর এইভাবেই সংঘটিত হয় প্রকৃতির পরির্তন—শ্রমের মাধ্যমে হয় সৃষ্টি। কিন্তু এই শ্রম শুধু প্রকৃতিকেই পরিবর্তন করে না—পরিবর্তিত করে শ্রমের প্রয়োগকারী মানুষকেও। মার্কসের ভাষায়, 'এইভাবে মানুষ বহির্জগতের উপর কর্ম-প্রয়োগ করা এবং তাকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে নিজের প্রকৃতিকেও সে পরিবর্তন করে। সে তার নিদ্রিত শক্তিগুলিকে জাগরিত করে এবং নিজের নির্দেশমত তাদের সচল হতে বাধ্য করে।'[৭]

কিন্তু মানুষের এই শ্রমের সঙ্গে আদিম প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত শ্রমের প্রকৃতির একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। আদিম মানুষের শ্রম যেন ছিল জন্তুর শ্রমেরই সামিল। আজ মানুষের শ্রম-শক্তির দ্বারা সৃষ্ট বস্তু পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য। মানুষের শ্রমের এই পরিণতি এবং মানুষের শ্রমের আদিম-রূপের মধ্যে নিহিত রয়েছে অসীম কালের ব্যবধান। এই পরিণত মানবিক শ্রমের সঙ্গে জন্তুর শ্রমের যে ফারাক তার মূল হচ্ছে মানুষের কল্পনা। এই পার্থক্যকে মার্কস এক অতি সুন্দর উদাহরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। মার্কস বলছেন, 'একটা মাকড়সা যে (বুননের) কাজ করে তা একজন তাঁতীর কাজের মতই মনে হয় এবং একটা মৌমাছি যে ভাবে তার মৌচাক সৃষ্টি করে তাতে অনেক স্থপতিই লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু একটা নিকৃষ্ট স্থপতির সঙ্গে একটা শ্রেষ্ঠ মৌমাছির যে পার্থক্য, তা হচ্ছে যে স্থপতি বাস্তবে তার সৃষ্টিকার্য শুরু করবার পূর্বে নিজের কল্পনায় একটা অবয়ব সৃষ্টি করে নেয়।'[৮]

এভাবে মানুষের শ্রমের প্রক্রিয়ার অন্তে সৃষ্ট বস্তু হল শ্রমের শুরুতে শ্রমিকের কল্পনায় যা এসেছিল তারই মূর্ত রূপ। এই শ্রম একটা রীতি ও ছন্দোবদ্ধ। শ্রমিক বা শিল্পী যে বস্তুর উপর শ্রম প্রয়োগ করে তাকে সে শুধু পরিবর্তিতই করে তা নয়, এই শ্রমের মাধ্যমে শিল্পী একটা উদ্দেশ্যকেও বাস্তবায়িত করে। তার কর্ম-পদ্ধতিও নির্ধারিত হয় তার এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই। শিল্পী তার দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন ভাবে চালনা করে যাতে তা তার উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হয়। আর প্রয়োজন হয় তার উদ্দেশ্যের প্রতি তার মনের নিবিড় আকর্ষণ। এই আকর্ষণ যত নিবিড়তর হবে মানুষ তার শ্রমের মধ্যে তত আনন্দ লাভ করবে। এখানেই নিহিত সৃষ্টির আনন্দের রহস্য।

আর সমস্ত সৃষ্টিরই বাস্তব উৎসরূপে বিরাজমান এই প্রকৃতি। স্রষ্টার সৃষ্টি সম্ভব হয় প্রকৃতি প্রদত্ত বিষয়বস্তুর উপর শ্রম প্রয়োগের মাধ্যমেই। কোন বিষয়বস্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রমের প্রয়োগ এবং স্রষ্টার কল্পনার যুগপৎ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় অভিনব বস্তুতে এবং তাই সৃষ্টি। তাই সৃষ্টির উৎসও প্রকৃতি।

কিন্তু শ্রম এবং প্রকৃতি-প্রদত্ত বিষয়বস্তুর মিলন সর্বদাই সরাসরি হয় না। উভয়ের মধ্যস্থলে প্রয়োজন হয় শ্রমের যন্ত্রের। শ্রমিক বা শিল্পীর কর্ম সঞ্চালিত হয় এই যন্ত্রের মাধ্যমেই। আদিম মানুষ গাছের ফল সংগ্রহে নিজের অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গকেই শ্রমের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু মানুষের এই অতি প্রাথমিক প্রচেষ্টার কথা অতিক্রম করে একটু অগ্রসর হলেই দেখা যায় শ্রম তার বিষয়বস্তুর নাগাল সরাসরি পায় নি, পেয়েছে যন্ত্রের মাধ্যমে। তাই শ্রম প্রথম নাগাল পেয়েছে তার যন্ত্রের এবং সেই যন্ত্রের মাধ্যমে তার বিষয়-বস্তুর। অর্থাৎ, প্রকৃতিকে মানুষ আবার আত্মস্থ করেছে তার কর্ম সঞ্চালনের একটি অঙ্গ হিসাবেও। মার্কসের প্রাঞ্জল ভাষায়, 'এভাবে প্রকৃতি তার কর্ম পরিচালনার একটি অঙ্গে পরিণত হয়, যে অঙ্গ বাইবেলের আখ্যান সত্ত্বেও সে আপন দেহে জুড়ে দেয় এবং নিজের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে।'[৯]

মানুষ তার প্রথম খাদ্য যেমন এই পৃথিবী থেকেই আহরণ করেছে তেমনি তার শ্রমের প্রথম যন্ত্রও সে আহরণ করেছে এই পৃথিবী থেকেই। প্রকৃতির বুক থেকেই একখণ্ড প্রস্তর সংগ্রহ করে তার সাহায্যে আঘাত, ঘর্ষণ-মার্জন ও কর্তন দ্বারা শ্রমের বিষয়বস্তুকে সে দিয়েছে এক পরিবর্তিত রূপ—সৃষ্টি করেছে প্রথমতঃ তার ব্যবহারের উপযোগী বস্তু এবং উন্নততর পর্যায়ে তার আশু ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে তার আত্মিক তৃষ্ণা নিবারণের সামগ্রী। প্রস্তর খণ্ডকে শাণিত করে প্রথম হয়ত সে শিকারের কাজে তাকে ব্যবহার করেছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে জীবনধারণের আশু তাগিদকেও অতিক্রম করে শাণিত প্রস্তরখণ্ড বা শাণিত ধাতুখণ্ডের সাহায্যে সে যখন পর্বতগাত্র খোদাই করে জীব-জন্তু বা কোন মানব মূর্তি সৃষ্টি করেছিল তখন তার মধ্যে মানবজীবনের প্রথম নন্দনতাত্ত্বিক অনুভূতিই রূপ পেয়েছিল। মানবের শ্রমের সঙ্গে প্রকৃতির এই পারস্পরিক সংযোগ, অর্থাৎ শ্রম—শ্রমের যন্ত্র—শ্রমের বিষয়-বস্তু (আর এই শেষোক্ত দুইটিই প্রকৃতি থেকে আহরিত)—একদিকে যেমন আধুনিক পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত সমস্ত উৎপাদিত সামগ্রী, অন্যদিকে তেমনি তা গ্রীক-রোম-ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে অবনীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের আধুনিকতম শিল্পকলা পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টির মূলে নিহিত। আর যেটা বিশেষ উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে, শ্রম ও প্রকৃতির এই সমন্বয় মানুষ ঘটিয়েছে প্রাথমিক ভাবে কল্পনায় সৃষ্ট বস্তুর একটা অবয়ব রচনা করে নিয়ে—এবং এইটাই তো মানুষের সঙ্গে জন্তুর শ্রমের মূল পার্থক্য।

আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হচ্ছে বিভিন্ন উপাদান-সমন্বিত শ্রমের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষ তার মানবিক চাহিদাগুলি—তা তার বস্তুগত বা আত্মিক যাই হোক না কেন—যেমন পূরণ করে, আবার তেমনি এই

শ্রমের প্রক্রিয়াই হচ্ছে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে বস্তুর আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয় সর্ত। মার্কস বলেছেন, 'মানবের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য এটা হচ্ছে প্রকৃতি কর্তৃক আরোপিত একটা চিরন্তন সর্ত, তাই তা মানব মস্তিষ্কের যে কোন পর্যায় নিরপেক্ষ; অথবা বলা যায় সমস্ত পর্যায়েরই এটা একটা সাধারণ সর্ত।'[১০]

সৃষ্ট বস্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্ট হয়—এবং তা সমাজের পর্যায়-নিরপেক্ষ। সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর মধ্য দিয়ে সেই সৃষ্ট বস্তু কি ধরনের শ্রমের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কারণ শ্রমের এই প্রক্রিয়া যেহেতু সর্ব সমাজেই একই রূপ সমন্বিত,তাই সৃষ্ট বস্তুর গুণাবলীর মধ্য দিয়ে এই শ্রম দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ বা আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ—কোন সমাজে পরিচালিত হয়েছে তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। অন্ন গ্রহণের সময় যেমন অন্নের স্বাদ থেকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে এই অন্ন কোন ধরনের সমাজে উৎপাদিত হয়েছে, তা উপলব্ধি করতে হবে অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা। তেমনি একটা ভাস্কর্য যে শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বা আজও একটি ভাস্কর্য যে শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয় তা একান্তই সাধারণ গুণাবলী-বিশিষ্ট। সেই ভাস্কর্য সৃষ্টির পশ্চাতে দাসমালিকের বেত্র দণ্ড কাজ করেছিল কিনা তা ভাস্কর্যের নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সমাজতাত্ত্বিক অন্যান্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

তাই শ্রমের প্রক্রিয়ায়—সৃষ্টির পৃষ্ঠপটে—শ্রম ও প্রকৃতির এই পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের বিকাশের পর্যায়-নিরপেক্ষ—মানব ইতিহাসে তা চিরন্তন।

আদিম প্রবৃত্তি ও শিল্পসৃষ্টি

প্রয়োজনের নিদারুণ তাড়নায় মানুষের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হয় না, সক্রিয়তাই তার অস্তিত্বধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সর্ত হিসাবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তার সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যই এই যে সে তার শ্রমের মধ্য দিয়ে সরাসরি প্রকৃতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না। বস্তুকে সে তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানবের প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে সে রূপান্তরিত করে এবং তারপর সে পৃথিবীর সামনে সেই রূপান্তরিত বস্তুকে নতুন পরিচয়ে উপস্থিত করে। এইভাবে মানবিক চাহিদা মানুষকে একটা সক্রিয় সত্তায় পরিণত করে এবং তার এই সক্রিয়তার দ্বারাই সৃষ্টি হয় একটা

মানবিক জগৎ—যে জগতের অস্তিত্ব মানবের সক্রিয়তা-নিরপেক্ষভাবে কোনদিন বিরাজ করেনি।

শিল্প সৃষ্টি বলতে যা বোঝা যায়—নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যসমন্বিত এমন কোন কিছু সৃষ্টির পূর্বে মানুষের শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতাকে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেতে হয়েছে। শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতার নিম্নপর্যায়ে মানুষের সৃষ্ট বস্তু ও মানুষের আশু চাহিদা পূরণের মধ্যে ফারাকও ছিল সংক্ষিপ্ততম। সেই পর্যায়ে মানুষের যা উৎপাদিত সামগ্রী ছিল তাই ছিল তার অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। পৃথিবীর ইতিহাসে যে পর্যায়ে এমন বস্তু উৎপাদিত হল যে তা একদিকে যেমন মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজনেরও সমাধান করে আবার তেমনি তার নন্দনতাত্ত্বিক আকাঙ্ক্ষারও সন্তোষ বিধান করে—সে পর্যায় ছিল শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা ও নিপুণতার অপেক্ষাকৃত এক উচ্চপর্যায়। আরো এক উচ্চ পর্যায়ে শ্রম এমন বস্তুও সৃষ্টি করতে সমর্থ হল যা ব্যবহারিক মূল্য-বোধকে অতিক্রম করে শিল্প সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হল। তাই ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিচারে শিল্প-কলাসৃষ্টি এবং মানুষ ও মানুষের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে একটা নন্দনতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রম হল একটি প্রয়োজনীয় সর্ত। শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আদি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে অফুরন্ত শিল্প-কলা, সৃষ্টি হয়েছে অপরিসীম প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ভাণ্ডার—মানুষের আত্মিক তৃপ্তির সমগ্র সম্পদ। শ্রমের প্রয়োগের দ্বারাই প্রকৃতিকে মানুষ করেছে রূপান্তরিত, দিয়েছে মানবায়িত রূপ।

কিন্তু সমাজ বিকাশের ধারায়, উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির পর্যায়ক্রমে শ্রমের প্রয়োগের চরিত্রও পরিবর্তিত হয়েছে। শিল্পসৃষ্টির উষালগ্নে, প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিল্প ও শ্রমের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র দৃশ্যমান হয় আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায়, বিশেষ করে বৃহৎ শিল্প-কারখানা-সমন্বিত সমাজে সেই যোগসূত্র যেন ক্রম-ক্ষীয়মাণ রূপেই প্রতিভাত। শ্রম-বিভাজনের তীব্রতা মানুষের মস্তিষ্ক ও মানুষের হস্তের পার্থক্যকে করে তুলেছে আরও দুস্তর। ফলে লক্ষ্য ও লক্ষ্য সাধনের পন্থার মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। এর সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্রমের পূর্বতন পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিশীল চরিত্রটি ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে বসেছে এবং শিল্প একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড এবং মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতার একটা সুস্পষ্ট মূর্তরূপ হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন একটা বাস্তব সত্যকে মানুষের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে যায়। মানুষের বিস্মরণ ঘটিয়ে

দেয় যে মানবেতিহাসে শিল্প-সৃষ্টির উৎস ছিল মানুষের নিখাদ শ্রম। বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে যেতে চায় সেই সত্য, যে শ্রম—অর্থাৎ যে সচেতন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষ পার্থিব বস্তুকে পরিবর্তিত ও মানবায়িত করে—সেই শ্রমই পৃথিবীর বুকে সম্ভব করে তুলেছে শিল্প সৃষ্টি।

মানব সভ্যতার আদি যুগে শ্রমের হাতিয়ার সৃষ্টি ও তার প্রয়োগের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধীয় তাৎপর্যটাই দিল সর্বপ্রধান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব প্রয়োজনে বস্তুর ঠিক এই সদ্ব্যবহারই মানুষের জন্য এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় যে অবস্থায় মানুষের সৃজনশীল ক্ষমতা নিতান্ত ব্যবহারিক লক্ষ্যকে অতিক্রান্ত করতে পারে। শ্রম প্রয়োগের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তার সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহারিক মূল্যায়ণ করতেও সমর্থ হয় এবং তার লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সৃষ্ট বস্তুর সৌষ্ঠব বৃদ্ধির প্রবণতাও তার মধ্যে প্রবলতর হয়। শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই প্রবণতার ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যখন আবিষ্কার করতে শিখল যে কতকগুলি বস্তু তার আকার-ভেদের দরুন মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী, তখন তার এই আবিষ্কার শ্রমকে শিল্প-কলায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে পালন করল এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। হাতিয়ার উৎপাদনে ক্রমোৎকর্ষ, বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার, অভিজ্ঞতা অর্জন এবং কর্মের নিরন্তর অভ্যাস অধিকতর সৌকর্য-সম্পন্ন বস্তুর উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করল। তার ব্যবহারোপযোগী বস্তুর এই সৌকর্যসাধনের সঙ্গে স্রষ্টার একটা বিশেষ মানসিক তৃপ্তিরও সমন্বয় ঘটে।

সৃষ্ট বস্তুর রূপের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আপন শ্রমের লক্ষ্য সম্বন্ধেও প্রাগৈতিহাসিক মানবের অনুরাগের বিভিন্নতা ঘটে। এই অনুরাগ দুই ক্ষেত্রেইপ্রতীয়মান হয়—সৃষ্টবস্তুর ব্যবহারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং তৎসহ মানুষের আত্মিক তৃপ্তি সাধনে সেই বস্তুর সামর্থ্যের ক্ষেত্রেও। সৃষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে যখন দ্বিতীয় গুণটি প্রাধান্য লাভ করে তখন সেই বস্তু কেবল মাত্র তার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করে একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিত ও নতুন মূল্যে সঞ্জীবিত হয় এবং মানুষের মনে এমন একটা তৃপ্তির সঞ্চার করে যাকে আধুনিক ভাষায় সৌন্দর্যবোধ হিসাবে অভিহিত করা যায়।

তাই প্রাগৈতিহাসিক মানবের শ্রম ও সৌন্দর্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে এই সত্য নির্দ্ধারিত হয় যে কালপঞ্জীতে মানুষের

শিল্পবোধ বা শিল্পসৃষ্টির স্থান মানুষের শ্রমের পর, শ্রমের পূর্বে নয়। শুধু তাই নয়, মানুষের শ্রমই এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছিল যে অবস্থায় শিল্প-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। প্লেখানভ তাঁর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, "শ্রম শিল্পকলার অপেক্ষা প্রাচীনতর......মানুষ বস্তুসমূহকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে প্রথমে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করে, কেবল পরবর্তীকালে সে ঐগুলি সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে।"[১১]

ব্যবহারিক মূল্যের অতিক্রমণ ও শিল্পসৃষ্টি

মানবজাতির সুদূরতম অতীতের অনুসন্ধান থেকে এটা প্রতিপন্ন হয়েছে প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিল্প এবং যাদুবিদ্যার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ঐ যুগের গুহাসমূহে যে জন্তুগুলির চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিকারীর হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করত। এই চিত্রগুলি ছিল বাইসন, বন্য ঘোটক ইত্যাদি জন্তুর। এটা মনে করার কারণ নেই যে ঐ চিত্রগুলি অঙ্কন করা হয়েছিল কোন সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রেরণা থেকে। গুহাগুলির অন্ধকারতম এবং দুর্গম অংশগুলিতেই সাধারণত ঐ চিত্রগুলি অঙ্কন করা হয়ে থাকত। কোন সৌন্দর্যবোধের প্রেরণা থাকলে অবশ্যই ঐ ধরনের স্থানে ঐগুলি অঙ্কিত হত না। বস্তুতঃ ঐ চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছিল একটা যাদুবিদ্যার প্রয়োগ হিসাবেই। যেন কোন বর্শাফলকের দ্বারা জন্তুগুলি বিদ্ধ হচ্ছে এমন ভাবেই চিত্রগুলিকে আঁকা হয়েছিল। এর একটাই প্রেরণা ছিল—তা হল বাস্তব জীবনে ঐ ভয়াবহ জন্তুগুলিকে হত্যা করা যেন সম্ভব হয়।

আবার যখন নৃবিদ্যার অনুসন্ধানে এটাও আবিষ্কৃত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ, বল্গাহরিণ বা ম্যামথের অস্থির উপর কি সুচারু সামঞ্জস্যের সঙ্গে ডোরা কাটত, তখন কিন্তু এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছাতে হয় যে জন্তুর অস্থির উপর সুসমঞ্জস ডোরা-কাটা কোন ভীতির কারণজনিত যাদুমন্ত্রের প্রয়োগ হিসাবে করা হয় নি, বা করা হয় নি কোন ব্যবহারিক তাগিদ থেকেও, বরং তা করা হয়েছে নিতান্তই সাজানোর অর্থাৎ সৌন্দর্যসৃষ্টির মনোভাব থেকেই!

কিন্তু অস্থির উপর এই ডোরা কাটা অনেক পরের কথা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানবের কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে একটা বিশেষ কারুকৃতি হিসাবে শিল্পকলা সেই যুগের মানুষের অস্তিত্বরক্ষা, আত্মরক্ষা এবং খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছিল। বাস্তব

প্রয়োগ কৌশলের অনুরূপ এবং বিশেষ করে মানুষের দুর্বলতাগুলির পাল্টা হিসাবেই—শিল্পকলা মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যস্থতাকারী শক্তি হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছে।

কোন জন্তুর চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে শিকারী-শিল্পী বাস্তব জীবনে যে জন্তুকে শিকার করা সম্ভব হয় নি, সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তোলার চেষ্টা করেছে। শিকারী হিসাবে যে বস্তুগুলি তাকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করেছে, শিল্পী হিসাবেও সেইগুলিকেই শিল্পরূপ দেবার চেষ্টা সে করেছে। ঠিক এই কারণেই আদিমযুগের শিল্পী প্রধানতঃ শিকারোপযোগী জন্তুসমূহ অথবা ভীতি-সঞ্চারকারী অন্যান্য জন্তুর চিত্রই অঙ্কন করত এবং কোন মানুষ,গাছপালা পাখীর চিত্র অঙ্কন খুবই দুর্লভ ছিল।

এই সৌন্দর্যবোধ ব্যবহারিক মূল্যকে অতিক্রম করতে চেয়েও যেন সফল হতে পারছে না, আবার প্রত্যাবর্তন করতে হচ্ছে ব্যবহারিক মূল্যেই। কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পকে এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হল যেখানে সে নিজের সৃষ্টিধর্মী অস্তিত্বকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হল। একটা প্রতিকূল প্রাকৃতিক জগতে অবলম্ব চিত্রণের মধ্য দিয়ে নতুন বাস্তবতার সৃষ্টি—আবার যে সৃষ্টি হল প্রতিষ্ঠিত বাস্তবেরই প্রতিফলন—এই রকম একটা সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হল।

যে পদ্ধতিতে শিকারী-শিল্পী এই দুইটি বাস্তবতার সংযোগ ঘটিয়েছিল তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে জগৎ সম্পর্কে তার ঐন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে। এই ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী চিত্রিত বস্তু এবং বস্তু জগতের বস্তু—উভয়েই ছিল সমপর্যায়ভুক্ত এবং সমভাবেই বাস্তব। ঐ শিল্পী যখন কোন বাইসনের চিত্র অঙ্কন করত তখন ঐ চিত্রিত জন্তুটি যতটা না বাস্তব জন্তুটির প্রতিমূর্তি হিসাব বিবেচিত হত, তার থেকে বেশী বিবেচিত হত তার বিকল্প রূপ হিসাবে। অর্থাৎ চিত্রটি বাইসনের ইমেজ নয়, বাইসনের ডুপ্লিকেট। এই প্রতিমূর্তিকে সে আহত করতে পারত, বা হত্যা করতেও পারত। আর অঙ্কিত চিত্রে তার এই ক্ষমতার প্রয়োগকে সে বাস্তব জীবনেও বিষয়ান্তরিত করতে চাইত। শিল্পের মধ্য দিয়ে সে বস্তুতঃ বাস্তবেরই বিকল্প সৃষ্টি করত। তার মনে এই ধারণাই ক্রিয়াশীল ছিল যে যতটা নিপুণতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে বন্য জন্তুটাকে চিত্রিত করতে পারবে ঠিক ততটা পরিপূর্ণতার সঙ্গেই বাস্তব জীবনে সে ঐ জন্তুটার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে। জগৎ সম্পর্কে একটা

ঐন্দ্রজালিক ধারণা থেকেই এই ধরনের সুগভীর বাস্তবতাবাদী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। কোন অঙ্কিত চিত্রের ঐন্দ্রজালিক গুণাগুণ নির্ভর করত সেই চিত্র বাস্তবতাকে কতটা নিখুঁত ও বিশ্বস্ত ভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছে তার উপরই। সেই বাস্তবতাটা আবার কোন একক জন্তুর মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, সেই জন্তুর শ্রেণীর মধ্যেই হবে তা প্রতিফলিত। যাতে চিত্রিত বস্তুর গুণাগুণ সেই বর্গের সমস্ত জন্তুর মধ্যেই ক্রিয়াশীল হয় তার জন্য অঙ্কন রীতিও জন্তুর বর্গকে প্রতিবিম্বিত করবার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হত। বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণ রেখার টানে অঙ্কিত এই সুগভীর বাস্তবতাময় চিত্রগুলি কোন একক জন্তুকে চিত্রিত না করে নির্বস্তুক ও সর্বজনীন ভাবে সেই জন্তুর বর্গকেই প্রতিবিম্বিত করত।

এই ভাবেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীর কাছে শিল্প এবং ইন্দ্রজাল পরস্পর মিশে গিয়েছিল। কিন্তু এই মিশ্রনও ঘটেছিল অনেক পরে, অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক শিল্প খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে যখন নিজেকে প্রকাশ করবার একাধিক মাধ্যম আবিষ্কার করে ফেলেছিল—আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ মানুষের শ্রমের পরবর্তী কালেই শিল্পের সঙ্গে যাদুবিদ্যার মিশ্রণ ঘটেছিল। তাই শিল্পের উৎস যাদুবিদ্যা নয়—শিল্পের উৎস শ্রম।

মানব শ্রমের সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হওযায় পরই শিল্প ঐন্দ্রজালিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমন্বিত হয় এবং সংকীর্ণ ব্যবহারিক তাৎপর্যকে অতিক্রম করে এক দিকে প্রতিরূপ ও অপর দিকে নির্বস্তুক সৃষ্টির সাফল্যে উন্নীত হয়।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এই ভাবেই শ্রম থেকে শিল্পের দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়েছিল—অগ্রসর হয়েছিল ব্যবহারিক মূল্য থেকে সৌন্দর্যবোধের উন্নততর চেতনায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার যে কারিগরী ঘাটতি ছিল, উৎপাদন শক্তির যে নিম্ন পর্যায় ছিল, তারই পরিপূরণের জন্য প্রাগৈতিহাসিক মানুষ শিল্পের সঙ্গে ইন্দ্রজালের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক বিশেষ প্রয়োগ কৌশল সৃষ্টির প্রয়াস করেছিল।

কিন্তু পরিণামে এই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি ঘটেছিল সার্থক শিল্পসৃষ্টিতে যে শিল্পের মূল তাৎপর্য সৌন্দর্য বোধ। পুরাতন প্রস্তর যুগের গুহা-শিল্পীরা যখন ব্যবহারিক-ঐন্দ্রজালিক কর্ম-সম্পাদনে নিবিষ্ট হত, তখন তার কর্মের নিপুণতাও পূর্ণাঙ্গতা সম্পর্কেও নিশ্চয়ই সে বেশ কিছুটা সচেতন ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সচেতন ছিল তার লক্ষ্য সম্পর্কে। এ লক্ষ্য হল ভীতিপ্রদ জন্তুগুলিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করা যাতে আকাঙ্ক্ষিত ঐন্দ্রজালিক ফলাফল লাভ করা যেতে পারে। আর

ঠিক তার ঐ লক্ষ্যকে সার্থক করার জন্য তাকে প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে বিভিন্ন ভাবে, করতে হয়েছে পরীক্ষা নিরীক্ষা। বারংবার রেখা টেনে, বারংবার অভীপ্সিত বস্তুর নকশা এঁকে এবং এই প্রক্রিয়ায় রেখা, রং এবং আঙ্গিকের সুনির্বাচনের মধ্য দিয়ে সে তার সৃষ্টিকে গুণগত ভাবে উন্নত করার চেষ্টা করেছে এবং তখনই সে তৃপ্তি লাভ করেছে যখন সে দেখেছে যে তার অঙ্কিত শিল্প তার ইতিপূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে গুণগুত ভাবে অতিক্রম করেছে। আর শিল্পীর এই উৎকর্ষতা-বোধকেই আধুনিকভাষায় বলা যায় নন্দনতাত্ত্বিক বোধ। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীদের অঙ্কিত কোন কোন চিত্রে যে অনুভূতি ও মাত্রা-বোধের সন্ধান মেলে, অঙ্কন পদ্ধতির যে সুগভীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং বিষয়বস্তু ও অঙ্কন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ সম্পর্কে যে অগ্রসর জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায় তার থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়। তা হচ্ছে, এই অঙ্কন কার্যের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল শিল্পীর একটা আত্মসচেতনতা ও একটা আনন্দ। আবার এই আত্মসচেতনতা ও আনন্দেরও উৎস ছিল ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টির কাজে শিল্পীর নিপুণ পরিপূর্ণতা-বোধ। এই প্রক্রিয়ারই সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবে ব্যবহারিক মূল্যসমন্বিত প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টির কাজে শিল্পীর অভিনিবেশ এবং তারই সঙ্গে যুক্ত শিল্পীর আত্মসচেতনতা ও নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দ শিল্পীকে তার সৃষ্টির ব্যবহারিক সীমানা অতিক্রম করতে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং সর্ব যুগের শিল্পের ন্যায় সেই যুগেও ব্যবহারিক মূল্যবোধ থেকে আপেক্ষিক ভাবে স্বতন্ত্র একটা সৌন্দর্যবোধের বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। শিল্প বলতে মানব সমাজের কাছে আজ যা বিরাজিত তার আবির্ভাব এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই হয়েছিল।

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস শিল্পকে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু শিল্পের এই ব্যবহারিক-ঐন্দ্রজালিক কর্ম-সম্পাদন শিল্পকে নন্দনতাত্ত্বিক চরিত্র থেকে বিচ্যুত করেনি, বরং তার পথ প্রশস্ত করেছিল। ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস শিল্পকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল কারণ মানুষ তার শ্রমের মধ্য দিয়ে এমন বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পেরেছিল যেখানে সৃষ্ট বস্তু শুধু মাত্র তার ব্যবহারিক মূল্যকে অতিক্রম ক'রে একই সঙ্গে সুন্দর ও উপযোগী বস্তু হতে পেরেছিল এবং কালক্রমে ঐ সৃষ্টি প্রধানতঃ এবং মূলতঃ সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি হিসাবেই উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের ধারায় শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের

উদ্ভব হলে, সৌন্দর্য সৃষ্টি শ্রমের বিভাজনের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছিল। শ্রম যখন বিভক্ত হল কায়িক শ্রম ও বুদ্ধিগত শ্রম হিসাবে, তখন শিল্প মানুষের একটা সুনির্দিষ্ট কর্ম হিসাবেই চিহ্নিত হল এবং শিল্প বস্তু তার প্রকাশ ভঙ্গিমা ও সৌন্দর্যের গুণে একপেশে ব্যবহারিক মূল্যকে অতিক্রম ক'রে মানুষের নন্দন-তাত্ত্বিক লক্ষ্য রূপে উন্নীত হল। শিল্পসৃষ্টির এই সমগ্র ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এটাই উদ্ভাসিত হয়—শ্রম এবং শিল্প পরস্পরকে প্রতিবিম্বিত করে—উভয়েরই সৃজনী চরিত্র এই নির্দেশই দেয় যে মানবজাতির ইতিহাসে শিল্প সৃষ্টির ঊষালগ্নে শ্রম এবং শিল্প পরস্পর অবিচ্ছিন্ন ছিল, বা আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় শ্রম থেকেই ঘটেছিল শিল্পের উদ্ভব।

১। এঙ্গেলস, ডায়ালেক্টিস্ অফ নেচার, পৃঃ ২৮১।
২। মার্কস, ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট, পৃঃ ৭৫।
৩। ঐ পৃঃ ৭৫-৭৬।
৪। ঐ পৃঃ ১৫৬।
৫। ঐ পৃঃ ১৫৭।
৬। ঐ পৃঃ ১৫৮।
৭। মার্কস, ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।
৮। ঐ পৃঃ ১৭৮।
৯। ঐ পৃঃ ১৭৯।
১০। ঐ পৃঃ ১৮৪।
১১। জি, প্লেখানভ, আন-এ্যাড্রেসড্ লেটার্স, মস্কো ১৯৫৭।

তৃতীয় অধ্যায়

সৌন্দর্যানুভূতির উৎস

শ্রম থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির উদ্ভব এবং শিল্প-সংস্কৃতি মানুষের মনে সৌন্দর্যানুভূতির সৃষ্টি করে। আবার প্রকৃতিও মানুষের মনকে সৌন্দর্যানুভূতিতে আপ্লুত করে। আন্তন চেখভের ভাষায়, 'মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি সীমাহীন।' এই সৌন্দর্যানুভূতিই মানুষকে শিল্প-সংস্কৃতি সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়—সৃষ্টি করে মানবজগতের অপূর্ব সংস্কৃতি সম্ভার, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক—সাহিত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, প্রেম ভালবাসা এই সৌন্দর্যানুভূতির সুষমায় মণ্ডিত। তা হলে এই সৌন্দর্যানুভূতির উৎস কোথায়? কেন মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধের উদয় হয়? প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নেরও সঠিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রয়োজন।

জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তত্ত্ব

জীববিজ্ঞানীরা এক সময় বলেছেন, প্রাণীর প্রাণ সম্পর্কিত প্রণালীর মধ্যেই সৌন্দর্যানুভূতির উৎস নিহিত এবং তাই এই অনুভূতি উচ্চতর এবং নিম্নতর উভয় শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই বিদ্যমান।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সৌন্দর্যানুভূতি কেবল মাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষ কতকগুলি বর্ণ এবং শব্দ মানুষ এবং নিম্নতর প্রাণী উভয়কেই আনন্দ দেয়। যেমন তিনি উদাহরণ দিয়ে এক ধরনের প্রাণীর [১] নাম করে বলেছিলেন যে এদের স্বাদ ও সৌন্দর্য উভয় অনুভূতিই বিদ্যমান। পাখীদের সম্বন্ধে ডারউইন বলেছেন যে স্ত্রী পাখীরা পুরুষ পাখীদের উজ্জ্বল বর্ণ, সৌন্দর্য এবং মিষ্টি কণ্ঠস্বর খুব পছন্দ করে।

ডারউইনের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'অরিজিন অব স্পেসিস'-এ ডারউইন বিশ্লেষণ করেছেন কিভাবে সৌন্দর্যের বিষয় ও বস্তুগুলির উদ্ভব ঘটেছে প্রকৃতি থেকে। ডারউইন তার আলোচনা থেকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর মতে সুদূরতম অতীতে প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের অনুভূতির তৃপ্তিসাধনের জন্য সৃষ্টি হয় নি, এবং সৌন্দর্যের বহু আধারের সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেই, অর্থাৎ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। ডারউইনের

মতে, 'যদি সুন্দর বস্তুসমূহ কেবল মাত্র মানুষের তৃপ্তিসাধনের জন্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে এটা প্রমাণ করতে হবে যে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বে পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের পরবর্তীকালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল।'[২] ভূবিদ্যা সংক্রান্ত কতকগুলি উদাহরণ[৩] দিয়ে ডারউইন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেও পৃথিবীর বুকে সৌন্দর্য বিদ্যমান ছিল এবং সম্ভবতঃ এই সৌন্দর্যের বিষয়গুলি তার আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে সমপরিমাণেই বিরাজ করছে।

ডারউইন দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে মানুষের নয়নাভিরামের জন্য প্রকৃতি ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে নি—ফুলের সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করবার জন্য,কারণ এই কীটপতঙ্গের সাহায্যেই ফুলের পুনরুৎপাদন বা প্রজনন সংঘটিত হয়। ডারউইন লিখেছেন, 'ফুল প্রকৃতির সুন্দরতম সৃষ্টিগুলির অন্যতম ; কিন্তু সবুজ পাতার সঙ্গে তার একটা বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে একই সঙ্গে তা সুন্দরও বটে যাতে ফুলগুলি সহজেই কীটপতঙ্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।' [৪] এর পরই ডারউন বলেছেন, এই ফুল মানুষের সৃষ্টির বহু পূর্বেই পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিল। তিনি আরো বহু সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রাকৃতিক উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদির উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যসৃষ্টি সর্বোপরি পুনরুৎপাদনের জন্যই।

এই বিষয়ে তিনি আরো একটি বিশ্লেষণ উপস্থিত করছেন যা খুবই লক্ষ্যণীয়। তিনি বলেছেন, 'আমি স্বেচ্ছায় স্বীকার করছি যে এক বিরাট সংখ্যক পুরুষ প্রাণী আছে, যেমনআমাদেরসবচেয়ে সেরা জমকালো পাখীগুলি, কিছু কিছু মৎস্য, সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী জীব এবং এক বিরাট সংখ্যক চমৎকার বর্ণযুক্ত প্রজাপতি—এরা সকলে সৌন্দর্যের জন্যই সুন্দর ভাবে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটা ঘটেছে যৌন নির্বাচনের মধ্য দিয়েই অর্থাৎ, সুন্দরতর পুরুষ প্রাণীরা সব সময়েই স্ত্রী প্রাণীদের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছে এবং এটা মানুষের আনন্দের জন্য ঘটে নি। পাখীদের মিষ্টি সুরের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে সুন্দর বর্ণ এবং সুরেলা ধ্বনির প্রতি অনুরূপ আকর্ষণ প্রাণীজগতের এক বিরাট অংশের মধ্যেই বিরাজ করছে। যখন দেখা যায় যে স্ত্রীরাও পুরুষদের মতই সুন্দর, যেটা পাখী এবং প্রজাপতিদের মধ্যে মোটেই দুর্লভ নয়, তখন কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে যৌন নির্বাচনের ফলে লব্ধ বর্ণ একমাত্র পুরুষের পরিবর্তে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে।'[৫]

কিন্তু এই পর্যন্ত এসেই ডারউইন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। মানুষের এবং 'নিম্নতর প্রাণীদের' মনে কি ক'রে রূপ, রস, গন্ধের অনুভূতির সৃষ্টি হল, এক কথায় কোন প্রাকৃতিক বা জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ বা 'নিম্নতর প্রাণীদের' মনে সৌন্দর্যবোধের উদয় হল তা ডারউইনের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে গেছে। তিনি অত্যন্ত সরল ভাবেই স্বীকার করেছেন,

'মানুষ এবং নিম্নতর প্রাণীদের মনে কি করে প্রাথমিক সৌন্দর্যবোধের উদয় হল অর্থাৎ, বিশেষ কতকগুলি বর্ণ, আকৃতি এবং শব্দ থেকে কি করে একটা অদ্ভুত ধরনের সুখানুভবের ক্ষমতার সৃষ্টি হল—তা অতীব দুর্বোধ্য বিষয়। একই ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হই যদি আমরা অনুসন্ধান করি কেন কতকগুলি গন্ধ সুখানুভূতির সৃষ্টি করে আবার কতকগুলি বিরক্তির সৃষ্টি করে। এই বিষয়গুলিতে অভ্যাস বেশ কিছুটা কাজ করে বলে মনে হয়। কিন্তু প্রতিটি প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের মধ্যে নিশ্চয়ই এর কোন মৌল কারণ নিহিত রয়েছে।'৬

জীববিজ্ঞানের আলোকে সৌন্দর্যানুভূতির আদি কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে ডারউইন অবশেষে একটা জায়গায় এসে ঠেকে গেলেন।

ভাববাদী বিশ্লেষণ

বিষয়টির আরো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পূর্বে এই সম্পর্কে ভাববাদী ধারণাগুলিরও কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন।

ভাববাদী চিন্তা-ভাবনা এ তত্ত্বই প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে যে সৌন্দর্য একটা পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র গুণ বিশেষ এবং তা বহির্জগতের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক-রহিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সৌন্দর্য মানুষের মনে বা হৃদয়ে একটা স্বতোৎসারিত অনুভূতি বা আরো সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে সৌন্দর্য মানুষের আত্মিক সত্তারই বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবে একটা দুর্জ্ঞেয় ধর্মীয় তত্ত্ব থেকেই এই ধরনের ভাবনার বিকাশ ঘটেছে।

ঋগ্বেদ সংহিতায় উষার দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। উষার সৌন্দর্য ও দীপ্তি বৈদিক যুগের মানুষকে মুগ্ধ করে ছিল। তাই একাধিক সূক্ত ও বহু সংখ্যক ঋকে বৈদিক ঋষিরা বর্ণনা দিয়েছেন উষার এই সৌন্দর্যের। ঋগ্বেদ-সংহিতা থেকে উষার এই বর্ণনাসমূহের কিছু উদ্ধৃতি বাংলা ভাষায় নীচে দেওয়া হল ঃ

'১। উষা দেবতাগণ আলোক প্রকাশ করেছেন এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব

দিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন। যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেরূপ স্বীয় দীপ্তিদ্বারা জগতের সংস্কার ক'রে গমনশীল, দীপ্তিমান এবং মাতৃগণ প্রতিদিন গমন করেন। ২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হওয়ার পর রথ-যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভীসকলকে উষা দেবতাগণ রথে যোজিত করলেন এবং পূর্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করলেন; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষা দেবতাসকল শুভ্রবর্ণ সূর্যকে আশ্রয় করলেন। ৩। নেত্রী উষা দেবতাগণ উজ্জ্বল অস্ত্রধারী যোদ্ধাদের ন্যায় এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ পর্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন।......৪। উষা নর্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ প্রকাশ করে, সেরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেরূপ উষাও পূর্বদিকে গমন ক'রে বিশ্বভূবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করছেন। ৬। ...আলোক বিকসিতাঙ্গী উষা আমাদের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করেছেন।'[৭]

লক্ষ্যণীয় যে উষার দীপ্তিতে বিমুগ্ধ বৈদিক ঋষিরা উষাকে কল্পনা করেছেন দেবতারূপে এবং দেব-রূপের বিচ্ছুরণ হিসাবেই উষার সৌন্দর্যকে তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। উষাকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করার পরই ঋগ্বেদের রীতি অনুযায়ী ঋষিরা উষার নিকট প্রার্থনা করেছেন পার্থিব সম্পদের। ঐ সূক্তেই প্রার্থনা জানানো হচ্ছে :

'৭। ...হে উষা! তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্নপ্রদান কর। ৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই।'[৮]

বৈদিক সাহিত্যে প্রাকৃতিক জগতের যা কিছু সুন্দর বা যা কিছু ভীতি-সঞ্চারক বা যা কিছু অজেয় তার সব কিছুতেই আরোপ করা হয়েছে দেবত্ব এবং তাকেই পরিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে ভক্তিভাবে। প্রকৃতিতে দেবত্ব আরোপ করেই বৈদিক যুগের মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করতে চেয়েছে—মানবজীবনের সমৃদ্ধির জন্য প্রকৃতির উপাসনা করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এই ঐক্য প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি-সঞ্জাত নয়। বরং ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ এই ঐক্য প্রকৃতিকে দেবতাজ্ঞানের সম্পূর্ণ বিষয়ীভূত চিন্তারই ফলশ্রুতি। এই ঐক্যেরই মর্মগ্রাহী বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন :

'পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত

কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জনী দিয়া পথরোধপূর্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছা বলে কখনো বৃষ্টি কখনো বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাত শক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনি মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।'[৯]

পৃথিবীতে প্রথম আগমন ক'রে মানুষ প্রচণ্ড দাবাগ্নি, ঝটিকা বা এমনকি স্নিগ্ধ উষার সঙ্গেও দেবতা পাতিয়েছিল। দাবাগ্নি বা ঝটিকার সৌন্দর্য উপভোগ করা সেই প্রথম মানুষদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। উষার সৌন্দর্য তারা অনুভব করেছিল, কিন্তু তীব্র দাবাগ্নি ও ঝটিকার ভয়ঙ্কর রূপকে যেমন তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেছিল, তেমনি উষার সৌন্দর্য উপভোগ ক'রে তাকেও অনুরূপ দেবত্বে রূপান্তরিত করেছিল। এ ছিল প্রথম যুগের মানুষদের শুধু নয়—বৈদিক যুগের মানুষদেরও অনুভূতি।

কিন্তু চিরকাল তো মানুষ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর দেবত্ব আরোপ করে নি, এমন ভয়াল ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করবার জন্যও তাকে দেবতা-জ্ঞান করে নি, বরং বিপরীত ভাবে সেই ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যকেই সে মনে-প্রাণে উপভোগ করেছিল। তাই আধুনিককালের শরৎচন্দ্র সামুদ্রিক ঝড়ের তাণ্ডবে ভীত হয়ে তাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন না, বরং সেই সৌন্দর্যকেই উপ-ভোগ করেন সমগ্র মন-প্রাণ দিয়ে। তাই দুর্জয় সামুদ্রিক ঝড় দেখে শরৎ-চন্দ্রের মনে হয়,

'ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়েছিলে, আজ তুমিই তাদের সার্থক করলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনাও কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি?'[১০]

তারপর ঝড়ের সৌন্দর্যে বিভোর শরৎচন্দ্র মনে মনে বললেন, 'হে ঢেউ-সম্রাট! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি যেন দেখিয়া লইতে পারি।'[১১]

আধুনিক শরৎচন্দ্রের কাছে ঝড় আর দেবতা নয়, ঝড় প্রকৃতির সৌন্দর্যের এক প্রবল উচ্ছ্বাস। ঝড় দেবতা নয়, কিন্তু শরৎচন্দ্রের চিন্তায় ঝড় ভগবানের সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টি ঝড়কে শরৎচন্দ্র ভগবানের সৃষ্টি চক্ষু দিয়েই সার্থকভাবে উপভোগ করলেন।

কিন্তু মানুষ প্রকৃতির রূপকে অনুভব করে কিভাবে? রূপের বোধের উৎস কি?

প্রশ্নোপনিষদ্-এ গার্গ্য ও পিপ্পলাদের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে উপনিষদ্ এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে। সৌর্যায়ণী গার্গ্য পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করলেন, 'হে ভগবন্, এই পুরুষ শরীরে কাহারা নিদ্রা যান? কাহারাই বা ইহাতে জাগ্রত থাকেন? (দেহ ও ইন্দ্রিয় এই) উভয়ের মধ্যে কোন এই দেবতা স্বপ্নসমূহ দর্শন করেন? এই সুখানুভূতি কাহার? কাহাতেই বা সকলে একীভূত হন?'[১২]

পিপ্পলাদ এই প্রশ্নের যে দীর্ঘ উত্তর প্রদান করলেন তার একাংশে তিনি বললেন,

'পৃথিবী ও গন্ধতন্মাত্রা, জল ও রসতন্মাত্রা, তেজ ও রূপতন্মাত্রা, বায়ু ও স্পর্শতন্মাত্রা, আকাশ ও শব্দতন্মাত্রা; চক্ষু ও রূপ, কর্ণ ও শব্দ, নাসিকা ও গন্ধ, রসনা ও রস, স্পর্শেন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়, বাগিন্দ্রিয় ও বাক্য, দুই হস্ত ও গ্রহণীয় বস্তু, উপস্থ ও তদ্বিষয়, পায়ু ও তদ্বিষয়, দুইচরণ ও গন্তব্যস্থান; মন ও মন্তব্য বিষয়, বুদ্ধি ও বোদ্ধব্য বিষয়, অহঙ্কার ও তদ্বিষয়, চিত্ত ও তদ্বিষয়, জ্ঞানশক্তি ও তদ্বিষয়, সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ ও তাঁহাতে ওতপ্রোত নিখিলবিশ্ব (এই সমস্তই অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত হয়)।

'অধিকন্তু এই সর্বাধার আত্মাই (জীবদেহে) দ্রস্টা, স্রস্টা, শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী, কর্তা ও বিজ্ঞাতৃ-স্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবেশ করেন।'[১৩]

অর্থাৎ এই সমগ্র নিখিলবিশ্ব অক্ষর পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। আবার দ্রস্টা, স্রষ্টা, মননকারী এই পুরুষ অক্ষর পরমাত্মায় প্রবিষ্ট।

রূপসকল কিসে প্রতিষ্ঠিত? বৃহদারণ্যক উপনিষদ্-এ এই প্রশ্নের আরো উত্তর প্রদান করা হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই উত্তর আরো সুস্পষ্ট।

'শাকল্য বলিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি কিরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন যে কুরু ও পঞ্চাল দেশের ব্রাহ্মণদের প্রতি এই অবজ্ঞা বাক্য বলিলেন?" "আমি দেবতা ও প্রতিষ্ঠার সহিত দিক সকলকে জানি।" "যদি দেবতা প্রতিষ্ঠার

সহিত দিক সকলকে জানেন,(তবে বলুন) আপনি এই পূর্বদিকে কোন দেবতার সহিত অঙ্গীভূত।" "আদিত্যের সহিত একীভূত।" "সেই আদিত্য কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "চক্ষুতে।" "চক্ষু আবার কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ?" "রূপসকলে, কারণ (লোকে) চক্ষুর দ্বারা রূপসকলকে দেখে।" "রূপসকল কিসে প্রতিষ্ঠিত ?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "হৃদয়ে। হৃদয়ের দ্বারা লোকে রূপসকল জানে; অতএব হৃদয়েই রূপসকল প্রতিষ্ঠিত।" "যাজ্ঞবল্ক্য, ইহা এইরূপই বটে।" [১৪]

এই প্রশ্নোত্তরের সরলার্থ—রূপপ্রকাশের জন্য রূপেরই দ্বারা চক্ষু নির্মিত, এবং রূপগ্রহণের জন্য রূপের দ্বারা প্রয়োজিত হয়। আদিত্য, চক্ষু, পূর্বদিক ও পূর্বদিকে যত রূপ আছে, তৎসমস্তই রূপে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উহারা রূপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তারপর হৃদয়ই রূপাকারে পরিণত হয়, শয়ন লোকে হৃদয়ের দ্বারাই রূপসকলকে জানে এবং রূপসকলকে হৃদয়ের দ্বারা স্মরণ করে।

শরৎচন্দ্র ভগবানের দেওয়া যে চক্ষু দিয়ে ঝড়ের রূপ দেখেছিলেন সেই চক্ষু রূপের দ্বারাই নির্মিত এবং হৃদয়ই রূপাকারে পরিণত। রূপের অনুভূতি সম্পর্কে এটাই হচ্ছে উপনিষদ্-এর ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্ব এই ঔপনিষদিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত। মানুষের আত্মার মধ্যে বা হৃদয়ের মধ্যেই এই সৌন্দার্যানুভূতির উৎস নিহিত। সমগ্র রবীন্দ্র কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। এই চিন্তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতায় :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,—
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠলো আলো
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।'

তারপর আরো কয়েকটি লাইন :

তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না, না, না,

না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলি 'আমি'।
সেই আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সংগম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস ;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখার রঙে, সুখে দুঃখে।'[১৫]

রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতার এই বক্তব্যের সঙ্গে উপনিষদের পিপ্পলাদ বা যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যার কোন প্রভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন রচনা করেছেন এই কবিতাটি।

পিপ্পলাদ বলেছেন রূপের অনুভূতি নিহিত 'অক্ষর পুরুষে', যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন 'হৃদয়ে', আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমি'র গহনে'। বাস্তবে এঁরা সকলে একই কথা বলেছেন, —'আমি' থেকেই উৎপত্তি এই সৌন্দর্যবোধের। সৌন্দর্যবোধের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ঠিক বিপরীতভাবে এই হচ্ছে কানায় কানায় পূর্ণ ভাববাদী বিশ্লেষণ। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশ্লেষণকে মনে হয় নিতান্তই অসার ও বায়বীয়।

ইংরেজ কবি কীটসের বক্তব্যও অনুরূপ। সম্পূর্ণ ভাববাদী ধ্যান-ধারণা থেকেই তিনিও সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন—তাঁর সৌন্দর্য-উপলব্ধিও নিতান্তই ভাবাদী। সমাজ-বিকাশের এবং সঙ্গে সঙ্গে মানব-মনের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে তার কোন মিল নেই।

'Ode On A Grecian Urn'এ কীটসের এই সৌন্দর্য-উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে অতি সুস্পষ্টভাবে। কবির বিখ্যাত লাইন দুটি,

"Beauty is truth, truth beauty,"—that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."[১৬]

নন্দনতত্ত্বে ভাববাদী চিন্তাকে অতি চমৎকার ভাবেই বিকশিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' কবিতার বক্তব্য বা উপনিষদে পিপ্পলাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে কীটসের এই উপলব্ধির বাস্তবে কোন অমিলই নেই। বরং এঁরা সকলেই যেন অন্তিমে একই স্থানে এসে মিলিত হয়েছেন।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনুভূতিও প্রায় একইরূপ। নিখিলবিশ্ব 'অক্ষর পুরুষে' প্রতিষ্ঠিত—উপনিষদের এই ব্যাখ্যাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় ভিন্নতর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ হৃদয়েই নিহিত। নীচের এই লাইনক'টি ওয়ার্ডসওয়ার্থের চিন্তার সুস্পষ্ট নির্দেশক।

'Wisdom and spirit of the universe !
Thou Soul, that art the Eternity of thought !
And giv'st to forms and images a breath
And everlasting motion.'[১৭]

কাজেই উপনিষদে সৌন্দর্যবোধের যে ভাববাদী ধারণা ব্যক্ত হয়েছে ইংরেজ কবি কীটস ও ওয়ার্ডসওয়ার্থও অনুরূপ ভাববাদী ধারণায় বিভোর হয়েই সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দর্শনের গোড়া থেকেই দার্শনিকরা সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করেছেন এবং কি খ্রীষ্টান কি প্যাগান, সর্বস্তরের দার্শনিকরা একটা উপলব্ধিতেই এসে পৌঁছেছিলেন যে ইহজগতে কোন মঙ্গল নেই, কোন সত্য নেই এবং নেই কোন সুন্দর। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর সন্ধান তাঁরা করেছিলেন অনন্ত বিশ্বে—ইহজগতের অপর পারে। এটাই ছিল সমস্ত অধিবিদ্যারই মূল কথা। প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর অনুসারী রোমের দার্শনিক প্লটিনাস ঈশ্বরের মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন অনিন্দ্যসুন্দরকে। তাঁর ভাষ্য: 'সুনিশ্চিতভাবে সমস্ত দেবতারাই মহৎ এবং সুন্দর, এই সৌন্দর্য আমাদের ভাষাতীত।'[১৮]

এই দর্শনেরই ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছে রোমান্টিক কবি কীটসের অন্তরেও। এই দর্শনের সরলার্থ—যা শাশ্বত তারই অপর নাম সত্য। এই সত্যকে উপলব্ধি করা যায় যুক্তির মাধ্যমে নয়, কল্পনার মাধ্যমে। এই সত্যকেই কীটস বলেছেন 'সৌন্দর্য'। একমাত্র কল্পনার বিভোরতার মধ্য দিয়েই একে উপলব্ধি করা যায়—যা একাধারে সত্য এবং সুন্দর। এখানে আবার কীটসের সঙ্গে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব মিল। অধিকতর কাব্যিক ভাষায় রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিকেই স্পষ্টতর রূপে ব্যক্ত করেছেন:

"ঈশ্বর 'সত্যং'। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।……

"কিন্তু, তিনি তো শুধু সত্য নন, তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং……

"এই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে।

"অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে 'ছাই তোমার সৌন্দর্য', মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয় ; কোন আইন নেই, কোন পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।"[১৯]

ভাববাদী দর্শনের এই সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে মানবসমাজের বিকাশের প্রক্রিয়ায় কোন সম্পর্ক নেই—সৌন্দর্য এখানে সামাজিক প্রক্রিয়া-নিরপেক্ষ, সৌন্দর্যানুভূতিতে মানুষের শ্রমের কোন ভূমিকা নেই।

স্বভাবতই ভাববাদী বিশ্ববীক্ষার মত সৌন্দর্যানুভূতির এই ভাববাদী ব্যাখ্যাও নিতান্তই অসার। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোন সঙ্গতি নেই। ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিশ্ব-প্রকৃতির সম্পর্ক, মানবসমাজের বিকাশ ও মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উৎস সম্পর্কে যে সুসঙ্গত বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছে ভাববাদী দর্শনের উল্লিখিত ব্যাখ্যা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

শ্রম ও সামাজিক অনুশীলনের ভূমিকা

'হৃদয়', 'অক্ষর পুরুষ', 'সত্যই সুন্দর' এবং 'সুন্দরই সত্য' ইত্যাদি বিমূর্ত আখ্যা ব্যবহার ক'রে ভাববাদীরা আসল প্রশ্ন থেকে দূরে সরে গেছেন। সত্যানুসন্ধান তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অপর দিকে ডারউইনের মত বিজ্ঞানী যিনি বিজ্ঞান জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন তিনিও একটা জায়গায় এসে মৌন হয়ে গেলেন, আর অগ্রসর হতে পারলেন না।

এই বিষয়ে বরং আর একজন বস্তুবাদী জীববিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল আরও কিছুদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। হেকেল বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। ছন্দ, সামঞ্জস্য, জীব-বিজ্ঞান বা নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যৌন সম্পর্ক এবং দৃশ্যপটের মনোহারিত্ব ইত্যাদি সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যযুক্ত সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি একটা বিকাশের সুনির্দিষ্ট ধারা লক্ষ্য করেছিলেন। সহজ থেকে জটিলতর বা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর—এ ভাবেই তিনি এই ধারার গতি নির্দেশ করেছিলেন। মানুষের শৈশব থেকে সাবালকত্ব প্রাপ্তি বা বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ—এই

উভয় দিকেই মানুষের যে অগ্রগতি এবং তার সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্যবোধেরও যে বিকাশ ঘটেছে তার সাথেও উক্ত ধারার সামঞ্জস্য তিনি দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে মানুষ এবং তার ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশের ইতিহাস সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সাজ সজ্জার বিকাশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। হেকেলের মতানুসারে এই ইতিহাস থেকেই স্পর্শ, স্বাদ, সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পকলার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।[২০]

কিন্তু হেকেল যেভাবে মানুষের সৌন্দর্যবোধের বিকাশের ধারা এবং নিম্ন থেকে উচ্চস্তরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারার মধ্যে সমতা টেনেছেন তা থেকে সৌন্দর্যতত্ত্বের বিকাশের ধারার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যবিকাশের সঙ্গে মানুষের মনোরাজ্যে সৌন্দর্য-বোধ বিকাশের কি সম্পর্ক এবং শেষোক্ত সৌন্দর্যবোধের কি ভাবে উদয় হল তার ব্যাখ্যা হেকেলের তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

কিন্তু মানুষের দৃষ্টিশক্তি বিশ্লেষণ ক'রে হেকেল খুব সঠিক সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন যে একটা সুদীর্ঘ বিকাশের প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিই হল চক্ষু। বহির্জগতের দৃশ্যকে এই চক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি করা যায়। মানুষ এবং উচ্চতর প্রাণী উভয়েই এই গুণের অধিকারী।

সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ভাবগত কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের পর চক্ষুই হচ্ছে মানুষের সর্বাপেক্ষা সহায়ক শক্তি। মানুষ যদি লেখা, পড়া, আঁকা ইত্যাদি কর্মসম্পাদন করতে সক্ষম না হত অথবা যদি তার বহির্জগতের আকৃতি ও বর্ণের উপলব্ধি না থাকত তাহলে মানুষের ভাবরাজ্যের সৃষ্টিই আদৌ সম্ভব হত না।

দৃষ্টিশক্তির এই ব্যাখ্যা জীববিজ্ঞানের তত্ত্বে সঠিক হলেও সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও সীমিত। একমাত্র দৈহিক প্রয়োজন থেকেই আত্মিক জীবনের সৃষ্টি—হেকেলের এই তত্ত্ব নিতান্তই অসম্পূর্ণ। আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে দৈহিক চাহিদা একটা পূর্বসর্ত মাত্র।

হেকেলের ব্যাখ্যা কত সীমিত তা অনুভব করা যায় আর একটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করলে। মানুষের চক্ষু একটা সুদীর্ঘ বিকাশের ফল। কিন্তু একটা ঈগলের চক্ষু তো মানুষের চক্ষুর চেয়েও শক্তিশালী বা এমন কি একটা পিঁপড়ের চক্ষুর ক্ষমতাও মানুষের চক্ষু অপেক্ষা তীব্রতর। তার জন্য কি এ কথা বলা যায় যে যেহেতু ঈগল বা পিঁপড়ের চক্ষু অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন

তাই তাদের সৌন্দর্যবোধও মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ? আসলে মানুষের ইতিহাসে বস্তুগত ও আত্মিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় এমন সমস্ত যন্ত্রাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহায্য নিয়ে শুধু ঈগল বা পিঁপড়ের তুলনায় কেন অভাবনীয়রূপে বহু দূরস্থ গ্রহ উপগ্রহের যাবতীয় বিষয়বস্তু বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু বা অদৃশ্য আলোকরশ্মির খেলাও আজ মানুষের দৃষ্টি গোচর। এই ভাবেই মানুষের জীবনবিজ্ঞান নির্দিষ্ট সীমানাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে এবং তাই মানুষ আজ অসীম ক্ষমতাশালী। কিন্তু তা সম্ভব হল কি ভাবে? মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের শ্রমই মানুষের এই সাফল্য নিয়ে এসেছে, জন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যকে আকাশ-পাতাল করে তুলেছে। হেকেল এই প্রক্রিয়াকে বলেছেন মানুষের আত্ম-সম্প্রসারণ, আর মার্কস একে বলেছেন মানুষের মানবায়ন।

তাই বিশ্ব-ইতিহাস হচ্ছে একটা জটিল প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ায় জন্তুর স্থূলতাকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, অনুভূতি ও উপলব্ধির বিকাশ সম্ভব হয়েছে, জন্তুর জগতে অজানা এমন সমস্ত অভিনব আত্মিক গুণাবলী অর্জন বা বস্তুগত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করা সম্ভবপর হয়েছে। মানবায়িত চক্ষু শুধু মাত্র দর্শন করার ইন্দ্রিয় নয়, মানবায়িত চক্ষুর দ্বারাই মানুষ প্রকৃতির সৌন্দর্য, শিল্পসুষমা, বর্ণের সমাবেশ ও তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য ইত্যাদি অনুভব করতে সক্ষম হয়। জন্তু তার চক্ষুর দ্বারা যা দেখতে সক্ষম হয় মানুষ তার চক্ষুর দ্বারা তদপেক্ষা অধিকতর দেখতে সমর্থ হয়।

মানুষ তার শ্রমের দ্বারা শুধুমাত্র তার পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন সাধন করে না, সে পরিবর্তন সাধন করে তার নিজের প্রকৃতিরও। সমস্ত উচ্চতর জন্তুই চক্ষুসমন্বিত এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত বস্তুই তার অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয়। কিন্তু মানুষের চক্ষু এমন একটা ইন্দ্রিয় যার দ্বারা সে শুধু পারিপার্শ্বিক বস্তুগুলিকে দর্শন করে তাই নয়, এই চক্ষু তাকে একটা আত্মিক দৃষ্টিশক্তিও প্রদান করে যার দ্বারা সে সৌন্দর্যের নিয়মানুযায়ী নতুন বস্তু সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় এবং মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই হয় শিল্পী।

এটা সম্ভব হয়েছে আদিম মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের শ্রম ও সামাজিক অনুশীলনের ফলেই। কার্ল মার্কস শ্রমের এই সৌন্দর্যগত দিকটার প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং সৌন্দর্যের নিয়মাবলী অনুযায়ী সৃজনমূলক কর্মের উল্লেখ করেছিলেন। মানুষ প্রথম পাথরের ছুরিখানা যখন প্রস্তুত

করেছিল তখন সেটি অমসৃণ ছিল। কিন্তু শিকারকে বধের সুবিধার জন্য যখন মানুষ তাকে মসৃণ করেছিল তখন প্রয়োজনের তাগিদে এই মসৃণতা সৃষ্টি হলেও মানুষের এই সামাজিক অনুশীলন অমসৃণ ছুরি ও মসৃণ ছুরির সৌন্দর্যগত পার্থক্যকেও মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছিল। সামাজিক অনুশীলন ও শ্রম মানুষের চোখে সৌন্দর্যবোধের উদয় ঘটাতে শুরু করল। এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কি চক্ষুতে, কি কর্ণতে, কি ঘ্রাণে মানুষ কোনটা নয়নাভিরাম, কোনটা শ্রুতিমধুর এবং কোনটা সুগন্ধী তার তুলনা করতে শিখল এবং ক্রমে ক্রমে তার মনে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হল। সুদীর্ঘ সামাজিক অনুশীলন ব্যতিরেকে এটা সম্ভব ছিল না। ভাববাদী দর্শন অনুযায়ী সৌন্দর্যবোধ আকস্মিক ভাবে 'অক্ষর পুরুষ' বা 'হৃদয়ে', প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বা ডারউইনের মত অনুযায়ী স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যেই এর সন্ধান পাওয়া যায় নি, এর সন্ধান পাওয়া যায় একমাত্র মানুষের শ্রম ও দীর্ঘ সামাজিক অনুশীলনের ইতিহাসের মধ্যেই। শ্রম ও সামাজিক অনুশীলনই মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকে মানবান্বিত করে তুলেছে এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইন্দ্রিয়গুলির মানবীয়করণ সম্পর্কে মার্কসের ব্যাখ্যার একটু দীর্ঘ উদ্ধৃতি বিষয়টিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলবে। মার্কস লিখছেন,

'সঙ্গীত যেহেতু শুধুমাত্র মানুষেরই সঙ্গীতবোধকে জাগ্রত করে, সঙ্গীতবিমুখ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে যেহেতু মধুরতম সঙ্গীতও অর্থবান হয়ে ওঠে না, মধুরতম সঙ্গীতও বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না (কেননা আমার বিষয় হল আমারই অন্যতম স্বকীয় শক্তির প্রমাণ এবং স্বকীয় শক্তির বিষয়ী ক্ষমতা থাকলেই বিষয়টি প্রতিভাত হয়, বোধশক্তি যতদূর যায় সেই পর্যন্তই বিষয়টি বোধগম্য হয়), সেহেতু সামাজিক মানুষের বোধবৃত্তিসমূহ অসামাজিক মানুষের বোধবৃত্তিগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানবসত্তার ঐশ্বর্যের বিষয়গতভাবে উন্মোচনের মাধ্যমেই কেবল তার বিষয়গত বোধবৃত্তি অংশতঃ বিকশিত হয় এবং অংশতঃ সৃষ্ট হয়। এই সব বোধবৃত্তি, যেমন সঙ্গীতরসজ্ঞ শ্রবণেন্দ্রিয়, রূপরসজ্ঞ দর্শনেন্দ্রিয়, সংক্ষেপে বলা যায় মানবিক সম্ভোগের বোধবৃত্তিসমূহ একান্তভাবেই মানবীয়। কারণ কেবলমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয়ই নয় এমন কি তথাকথিত মনোগত ও কর্মগত ইন্দ্রিয়গুলি (যেমন এষণা, প্রেম ইত্যাদি)—এক কথায় মানবিক বোধবৃত্তিসমূহ এবং বোধেন্দ্রিয়সমূহের মানবিকতা আবির্ভূত হয় মানবের বিষয়ের আবির্ভাবের ফলে, মানবিকীকৃত প্রকৃতির ফলে।

'পাঁচটি বোধেন্দ্রিয়ের গঠন হল আদ্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসের অবদান। প্রাত্যহিক প্রয়োজনের স্থূলতার মধ্যে যে বোধবৃত্তি সীমাবদ্ধ তার ভূমিকা সংকীর্ণ। বুভুক্ষু মানুষের কাছে খাদ্যের মানবিক আকার মিথ্যা, তার কাছে সত্য হল খাদ্যের আকার-নিরপেক্ষ সত্তা। নিছক স্থূলতম রূপেই তা পাওয়া যেত এবং কেউ বলতে পারে না বুভুক্ষু মানুষের খাদ্যগ্রহণ থেকে জন্তু জানোয়ারের খাদ্যগ্রহণে পার্থক্য কোথায়। অভাবক্লিষ্ট দুর্দশাপীড়িত মানুষের মনে সুন্দরতম নাটকেরও কোন আবেদন নেই; ধাতুদ্রব্যের কারবারী কেবল তার বাজার দরই দেখে; ধাতুর সৌন্দর্য বা স্বকীয়তা দেখে না। খনিজতত্ত্ব সম্পর্কে তার কোন বোধ নেই। সুতরাং তত্ত্বগত এবং কার্যগত উভয় দিক থেকেই মানুষের অস্তিত্বের বাস্তব রূপায়ণের অর্থই হল বোধেন্দ্রিয়সমূহের মানবিকীকরণ এবং সেই সঙ্গে মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের ঐশ্বর্য-সম্ভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয়সমূহের সৃজন।'[২১]

মানুষের সৌন্দর্যবোধ বিকাশের সামাজিক প্রক্রিয়া মার্কস তার বিশ্লেষণে অত্যন্ত অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশ করেছেন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অর্থাৎ 'পাঁচটি বোধেন্দ্রিয়ের গঠন হল আদ্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসের অবদান'— মানুষের সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টিতে সুদীর্ঘকালের শ্রম ও সামাজিক অনুশীলনের ভূমিকাকে মার্কস অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সঙ্গেই ব্যক্ত করেছেন। সমগ্র ভাববাদী চিন্তাধারা বা এই সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জীববিজ্ঞানী অনুসন্ধানের সঙ্গে মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফারাক এখানেই। মানুষের সৌন্দর্যবোধের বিকাশ কোন অজ্ঞেয় রহস্যের দ্বারাও আবৃত নয়, 'অক্ষর পুরুষে' আকস্মিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিতও নয়, শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের মধ্যেও তা আবদ্ধ নয়— এই সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে একই তালে অগ্রসরমান। আর এই সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশ সাধিত হচ্ছে কি প্রক্রিয়ায়? মানুষের দৈহিক ও মনোগত শ্রমের প্রক্রিয়ায়, আর এই শ্রমের প্রক্রিয়াতেই উদয় ঘটেছে মানুষের সৌন্দর্যবোধেরও। শুধুমাত্র আদিম মানুষের প্রথম ছুরিখানা তৈরীর ইতিহাস বা তাকে মসৃণ করার ইতিহাসই নয়, আদিম মানুষের প্রতিটি পর্যায়ের শ্রম—পর্বতের গুহায় জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কন, শিকার বা খাদ্য সংগ্রহের হাতিয়ার সৃষ্টি, পরবর্তী কালে বাসস্থান, পরিধান ইত্যাদির সৃষ্টি ও ব্যবহার, ভাষার ক্রমবিকাশ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুশীলনের মাধ্যমেই মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিও হয়েছে পরিশীলিত এবং মানুষ

শিখেছে—অসুন্দর থেকে সুন্দরের পার্থক্য উপলব্ধি করতে। শরৎচন্দ্র যখন সমুদ্রবক্ষে ঝড় প্রত্যক্ষ করেছিলেন তখন তিনি তা করেছিলেন মানবজাতির সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক অনুশীলনে পরিশীলিত বোধেন্দ্রিয় দিয়ে, যে বোধেন্দ্রিয় আদিম মানুষের বোধেন্দ্রিয় থেকে দুস্তর ব্যবধান-সমন্বিত। আদিম মানুষ তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে ঝড়কে ভয়াল রূপেই দেখেছে, তার মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায় নি, বরং তার কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাকে পূজা করেছে, আর শরৎচন্দ্র সহস্র সহস্র বৎসর পর সেই ঝড়ের মধ্যেই, তার ভয়ালতার মধ্যেই সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন এবং সেইসৌন্দর্য উপভোগর করেছেন। বোধেন্দ্রিয়ের এই বিকাশ 'আদ্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসেরই অবদান'।

মানুষের পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যবহার্য সামগ্রী, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আচার আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের সৌন্দর্যবোধের বিকাশ আদ্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসেরই অবদান। চিত্রকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি সর্বপ্রকার সৌন্দর্য-মণ্ডিত কর্মকাণ্ডই আদ্যন্ত বিশ্ব-ইতিহাসের অবদান। এইটাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এই ক্ষেত্রে ডারউইনের একটি বক্তব্য বিশেষ-ভাবে স্মর্তব্য। ডারউইন বলেছেন,

'আমি প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি যে সৌন্দর্যবোধ স্পষ্টতই মানুষের মনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, দৃষ্ট বস্তুর প্রকৃত গুণাগুণ-নিরপেক্ষ ভাবেই; এবং সুন্দর কি তার ধারণা অনড় বা অপরিবর্তনীয় নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখি যে বিভিন্ন জাতির পুরুষেরা তাদের নারীদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মাপকাঠিতে সৌন্দর্য উপলব্ধি করে।'[২২]

বক্তব্যটা সঠিক। কিন্তু এই অর্থেই সঠিক যে বিশ্ব-ইতিহাসের বিকাশ, শ্রম ও সামাজিক অনুশীলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় মানুষের বোধেন্দ্রিয়ের যে ক্রমবিকাশ ঘটেছে বা ক্রমান্বয়ে যে মানবিকীকরণ ঘটেছে তারই সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে মানুষের সৌন্দর্যবোধেরও পরিবর্তনীয়তার প্রবাহ লক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া উদাহরণস্বরূপ ডারউইন পুরুষের চোখে নারী সৌন্দর্যের যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন তারও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাসগত-ভাবে বিভিন্ন জাতির বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে।

বিভিন্ন জাতির বাসভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রকৃতির রুক্ষতা বা কমনীয়তা, প্রকৃতির সঙ্গে সেই জাতির মানুষের সংগ্রামের চরিত্র, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের পদ্ধতি এবং সর্বোপরি শ্রমের বিভাগের

প্রকৃতি সৌন্দর্যবোধেরও প্রভেদের কারণ। শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমের বিভাজন ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হলেও নারী পুরুষের শ্রমের বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল বহু পূর্বেই এবং তার বিশিষ্ট প্রকৃতিও জাতিতে জাতিতে সর্বত্র একই রূপ ছিল না। নারীর শ্রমের প্রকৃতির উপরও নির্ভর করত সেই জাতির নারীর সৌন্দর্যের মাপকাঠি। তাই ভারতীয় সমাজে নারীর সৌন্দর্য যে মাপকাঠিতে বিচার্য হয়েছে চীনা সমাজে বা গ্রীক সমাজে বা রোমক সমাজে ঠিক অনুরূপ ভাবেই হয় নি। শুধু নারীর সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেই বা কেন? পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি তৈরির পদ্ধতি, ব্যবহার্য সামগ্রীর সৌন্দর্য ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই জাতিতে জাতিতে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থেকেছে।

ডারউইন বিশেষভাবে নারীর সৌন্দর্যের যে উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তার অনুসন্ধান করলেও দেখা যাবে বিভিন্ন জাতির প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করেছে এই সৌন্দর্যের মাপকাঠির বিভিন্নতা। এখানেও সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কবি কালিদাস তাঁর কাব্যে নারীর সৌন্দর্যের যে অনন্য বর্ণনা দিয়েছেন প্রথমেই তার উল্লেখ করা যেতে পারে। মেঘদূত কাব্যে কালিদাস যক্ষপ্রিয়ার সৌন্দর্যের বর্ণনা দিচ্ছেন,

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥'[২৩]

অর্থাৎ, তুমি যাকে দেখতে পাবে তিনি তন্বী, তিনি শ্যামা, পক্ক দাড়িম্ব বীজের মত সূক্ষ্ম শিখরযুক্ত তাঁর দাঁত, পক্ক বিম্ব ফলের তুল্য তার অধর, ক্ষীণ কটি, গভীর নাভি, নিতম্বের গুরুভারে শিথিল গতি, স্তনভারে সামান্য আনত— তোমার মনে হবে যুবতি সৃষ্টিতে তিনিই বিধাতার প্রথম আদর্শ।

দেড় হাজার থেকে দু'হাজার বৎসর পূর্বের ভারতীয় মহাকবি কালিদাসের এই নারী-বর্ণনার সঙ্গে দু'হাজার বৎসর পূর্বে রোমান মহাকবি ভার্জিল-রচিত 'এনিড' কাব্যের নারী-বর্ণনার তুলনা করা যেতে পারে। 'এনিড' কাব্যে কবি ভার্জিল উষা দেবী আরোরার বর্ণনা দিচ্ছেন,

'Her spirited horse, caparisoned in a splendour of purple and gold, pawed the ground and champed a foaming bit. At

last she came, stepping forth with a numerous suite around her and clad in a Sidonian mantle with an embroidered hem. Golden was her quiver and the clasp which knotted her hair, and golden was the broach which fastened the purple tunic at her neck.'[২৪]

বর্ণনা এবং তার সঙ্গে সৌন্দর্যের মানদণ্ডের বৈপরীত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লক্ষ্যণীয়। ভারতীয় কবি কালিদাস নারীর যে ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে রোমান কবি ভার্জিল-কৃত যোদ্ধবেশিনী অরোরার সৌন্দর্য বর্ণনার কোন মিল নেই। কালিদাসের নারী কমনীয় যৌন সৌন্দর্যের অধিকারিণী, আর ভার্জিলের নারী মহিমান্বিত শৌর্যের অধিকারিণী। নারীকে এই দুই বিপরীতভাবে দেখার কারণও ঐতিহাসিক। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে, কি তার বাস্তব ইতিহাসে, কি তার পৌরাণিক কাহিনীতে নারীকে যোদ্ধবেশে দেখা বিরল ঘটনা। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভারতীয় সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন, ভারতীয় সমাজের নর-নারীর শ্রম বিভাগ নারীকে কোমল সৌন্দর্যেই প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু ইতালী বা গ্রীসের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঐ সমাজসমূহের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন বা নর-নারীর শ্রম বিভাগ নারীকে বিপরীত সৌন্দর্যেও প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই সমসাময়িক কালের দুই দেশের দুই কবির কাব্যে নারীর বর্ণনায়ও রয়েছে মূলগত প্রভেদ। এই প্রভেদ সামাজিক ঐতিহাসিক পরিবেশেই বিবেচ্য, জীববিজ্ঞানগত কারণে নয়।

তাই সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে প্লেখানভের একটি বিশ্লেষণ কিছুটা ভ্রান্তিপূর্ণ মনে হয়। প্লেখানভ সমাজজীবন ও শিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও তিনি যখন বলেন, 'কোন সমাজে বা শ্রেণীসমাজে কোন বিশেষ কালে সৌন্দর্যের আদর্শ অংশতঃ মানবজাতির জীববিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অবস্থার মধ্যে নিহিত যা ঘটনাক্রমে স্বকীয়তাপূর্ণ জাতিগত বৈশিষ্ট্যেরও সৃষ্টি করে—এবং অংশতঃ যে ঐতিহাসিক অবস্থায় ঐ বিশেষ সমাজ বা শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বা ঘটেছিল তার মধ্যে নিহিত,'[২৫] তখন তাঁর বক্তব্যের প্রথম অংশ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বিচারে সঠিক বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু প্লেখানভ যখন সৌন্দর্যের আদর্শ ঐতিহাসিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেন তখন তা অত্যন্ত সঠিক বলেই বিবেচনা করতে হয়।

মানবজাতির বিকাশের সমগ্র ইতিহাসই প্রমাণ করে যে সৌন্দর্যবোধ 'অক্ষর পুরুষে', 'পরমসত্তায়'বা 'হৃদয়ে' আকস্মিকভাবে আবির্ভূত কোন গুণ নয়, এই গুণ মানুষ আয়ত্ত করেছে তিলে তিলে, সমগ্র জগৎ-ইতিহাসের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সৌন্দর্যবোধকে বিষয় এবং বস্তুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যেই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বিষয়েরই অভিক্ষেপ রূপে সৌন্দর্যবোধ বিরাজমান, কোন অনড়, আকস্মিক বা জীববিজ্ঞানীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের উৎস সন্ধান করা বিশ্ব-ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং তাই তা অসার, অবাস্তব ও অসত্য। সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে সৌন্দর্যবোধের উদ্ভব ঘটেছে মানুষের ব্যবহারিক ও বস্তুগত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ শ্রমের উপর ভিত্তি করেই। এই কর্মকাণ্ড বিষয় ও বস্তুর মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে—বিষয়ের অস্তিত্ব বস্তুর জন্য, বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ের জন্য।

আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয়। ডারউইন বলেছেন যে পৃথিবীতে মানবজাতির আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে সৌন্দর্যসম্পন্ন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল। ছিল সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, ছিল সুন্দর ফুল-ফল বা প্রজাপতি, পাখি ইত্যাদি। আজ মানুষের বোধেন্দ্রিয় দিয়ে—যে বোধেন্দ্রিয়গুলি আবার উন্নত হয়েছে সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে—উপলব্ধি করা সম্ভব যে সুন্দর বস্তুর অস্তিত্ব মানবজাতির অস্তিত্বের পূর্ব থেকেই ছিল। কিন্তু প্রশ্নটা এই যে ঐ বস্তুগুলি যে প্রকৃতই সুন্দর তা মানবজাতির আবির্ভাব এবং তার বোধেন্দ্রিয়গুলি উন্নত হবার পূর্বে কি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল? মানবের উন্নত বোধেন্দ্রিয়ই নির্ধারণ করে কোনটা সুন্দর আর কোনটা অসুন্দর। তাই সুন্দরের সৌন্দর্য মানবজাতির বিকাশ-নিরপেক্ষ নয়, বরং তা নির্ভরশীল মানবের বোধেন্দ্রিয়ের উন্নততর বিকাশের প্রক্রিয়ার উপরই। বিষয় এবং বস্তুর সামাজিক সম্পর্কের পরিধির মধ্যে সৌন্দর্যবোধের অস্তিত্ব একটা সামাজিক সত্তাসম্পন্ন মানুষের জন্যই। সৌন্দর্যবোধের তাই রয়েছে একটা বাস্তবতা, একটা মানবিক ও সামাজিক বাস্তবতা এবং তা প্রকাশমান হয় কতকগুলি আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে এবং সেই আঙ্গিকের রয়েছে একটা বস্তুগত অস্তিত্ব। বিষয় কোন্ বস্তুকে কতটা আত্মিকগুণসম্পন্ন করতে পারে তা নির্ভর করে সেই আত্মিক গুণ কতটা সুনির্দিষ্ট ও ইন্দ্রিয়গত হয়ে ওঠে তার উপরই। যেমন একটা মার্বেল পাথর সাধারণভাবে বস্তুমাত্র। কিন্তু কোন শিল্পী যখন সেই মার্বেল পাথরকে

একটা মূর্তিতে রূপান্তরিত করে তখন সেই মার্বেল পাথর শিল্পীর দ্বারা আত্মিক গুণমণ্ডিত হয়ে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধ উদ্রেক করে। কিন্তু ঐ মূর্তি যে মানুষের মনে সৌন্দর্যবোধের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তার কারণ সৌন্দর্য ঐ মূর্তির মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়গত হয়ে উঠে।

মার্বেল পাথরের তৈরি মূর্তি মানুষের সৃষ্ট সৌন্দর্য। মানুষের শ্রমই করেছে এই সৌন্দর্য সৃষ্টি। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের বিষয় বস্তুর সামাজিক সম্পর্ক। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গেও রয়েছে মানুষের সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক। বস্তুতঃ মানুষের সৌন্দর্যবোধ প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রকৃতির সৌন্দর্য সামাজিক সত্তা হিসেবে মানুষকে বাদ দিয়ে অর্থহীন। কিন্তু আসল প্রশ্ন মানুষের মনে প্রকৃতির সৌন্দর্য-চেতনা সৃষ্টি হল কি প্রক্রিয়ায়, আরো সরল ভাষায় মানুষ কি করে প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন হল।

মানুষ যতদিন বন্য ছিল, জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেই তাকে একত্রে বাস করতে হত, ততদিন তার এই সৌন্দর্য-চেতনা সম্ভব ছিল না বর্বর মানুষের পছন্দ অপছন্দ দেখে ডারউইন এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ডারউইনের মতে বন্য অবস্থায় মানুষের অপেক্ষা কিছু কিছু প্রাণীর সৌন্দর্যবোধ বেশি ছিল। ডারউইনের বক্তব্য : 'কুৎসিৎ ধরনের সাজসজ্জা এবং সমান কুৎসিৎ ধরনের সুর ও ধ্বনি যেগুলি বর্বর মানুষরা পছন্দ করত, তা বিচার করে এই কথা বলা যায় যে তাদের সৌন্দর্যবোধ কয়েক ধরনের প্রাণী যেমন পাখি ইত্যাদির মত উচ্চতর ছিল না।'[২৬] অবশ্যই ডারউইনের এই বক্তব্য তাঁর নিজস্ব বিবর্তনবাদের তত্ত্ব দিয়েই সমর্থিত হয় না। আসল কথাটা হল জন্তুজগৎ থেকে মানুষের পৃথকীকরণই ছিল সৌন্দর্য-চেতনার পূর্বসর্ত। এই পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে, জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে মানুষের লড়াই এর মধ্য দিয়েই। মানুষ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এবং তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাস্তব অবস্থা সৃষ্টির জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে ও জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল এবং তার মধ্য দিয়ে সে শুধু প্রকৃতিকেই পরিবর্তন করে নি, সে পরিবর্তন করেছিল তার জীবনধারাকে।

প্রকৃতিকে মানুষ পরিবর্তিত করেছিল, প্রকৃতিকে 'মানবায়িত' করেছিল এবং নিজে সমাজবদ্ধ হয়েছিল। জন্তুজগত থেকে নিজেকে পৃথক করায় প্রকৃতিকে নিজের অস্তিত্বের উপযোগী করে পরিবর্তন করা অর্থাৎ মানবায়িত

করা এবং নিজেকে সমাজবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় মানুষকে যে সামাজিক শ্রম করতে হয়েছিল তার থেকেই উদ্ভব হয়েছিল প্রকৃতি সম্পর্কে তার সৌন্দর্য-চেতনা। তার এই সামাজিক জীবনের কাঠামোকে আরো পরিবর্তন করা এবং প্রকৃতিকে নিজের অস্তিত্বের তাগিদে আরো গড়ে-পিটে নেওয়ার ক্রমাগ্রসর প্রক্রিয়ায় এই চেতনা প্রখরতর হয়েছিল। অথবা এ ভাবেও বলা যায় যে প্রকৃতির সঙ্গে বা বিভিন্ন আকৃতির প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী যে শ্রম সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার দ্বারাই প্রকৃতি সম্পর্কে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তু সম্পর্কে তার কতকগুলি ধারণা সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক ধরন-ধারণ গড়ে উঠেছে, এবং আকৃতি, সামঞ্জস্য, বর্ণ বা বর্ণের সমাবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে তার একটা বিচারক্ষম চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিই হল প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের মনে সৌন্দর্য-বোধের উদ্ভব। প্রকৃতির যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য মানুষ সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিল, তা বাস্তব এবং অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল তখনই যখন সামাজিক শ্রমের দ্বারা মানুষের মনে সেই বিচারক্ষম চেতনার উন্মেষ ঘটল।

মানুষ ব্যতিরেকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের অস্তিত্ব অর্থহীন। শুধুমাত্র প্রকৃতি হিসাবে প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য-মূল্য থাকতে পারে না, প্রকৃতি তখনই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয় যখন তা মানবান্বিত হয়। প্রকৃতির কি নিজস্ব সৌন্দর্যের কোন প্রয়োজন আছে? মানুষেরই প্রয়োজন সৌন্দর্যের। সুন্দর বস্তুর মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে চায় প্রকাশ করতে, চায় প্রতিবিম্বিত হতে। আর মানুষের মনে এই সুন্দরের চেতনা সৃষ্টি হয় শ্রম—সামাজিক শ্রমের দ্বারা—যুগ যুগ ধরে যে শ্রম মানুষ প্রয়োগ করে এসেছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা ও নিজেকে সমাজবদ্ধ করার জন্য। যুগ-যুগের এই সামাজিক অনুশীলনই মানুষের মনকে করেছে পরিশীলিত, তার বোধেন্দ্রিয়গুলিকে করেছে উন্নততর, মানুষকে শিখিয়েছে অসুন্দর থেকে সুন্দরকে বেছে নিতে। এঙ্গেলসের ভাষায়, 'এটাই হচ্ছে পুরানো কাহিনী। প্রথমে ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলিকে বিমূর্তন করা হয় এবং তারপর সেগুলিকে ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা হয়……।'[২৭] মানুষের সৌন্দর্য-সৃষ্টি ও সৌন্দর্য-উপলব্ধির এটাই হল মূল কথা।

১। এই প্রাণীর নাম ডারউইন বলেছেন Chlamydosauria.
২। চার্লস ডারউইন, দি অরিজিন অফ স্পেসিস্। পৃঃ ১৮৫।

৩। 'Were the beautiful volutes and cone shells of the Eocene epoch, and the gracefully sculptured ammonites of the Secondary period, created that man might ages afterwards admire them in his cabinet?' ঐ, পৃঃ ১৮৫।

৪। ঐ

৫। ঐ পৃঃ ১৮৬।

৬। ঐ

৭। ঋগ্বেদ-সংহিতা, প্রথম মণ্ডল, ৯২ সূক্ত।

৮। ঐ

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, বিচিত্রা, পৃঃ ৯৫।

১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত, দ্বিতীয় পর্ব, শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পৃঃ ৯৪।

১১। ঐ

১২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, পৃঃ ১৬২—১৬৩।

১৩। ঐ, পৃঃ ১৭০—১৭২।

১৪। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২৬৬।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঞ্চয়িতা, পৃঃ ৭১১।

১৬। কীটস্, ওড অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন।

১৭। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, ইনফ্লুয়েন্স অফ ন্যাচারাল অবজেক্টস্।

১৮। ট্র্যাক্টেট অন ইনটেলেকচুয়াল বিউটি, অষ্টম খণ্ড, হিস্ট্রি অফ ওয়েষ্টার্ন ফিলজফি গ্রন্থের ২৯৯ পৃষ্ঠায় বার্টাণ্ড রাসেল কর্তৃক উল্লিখিত।

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌন্দর্য, বিচিত্রা, পৃঃ ২১৫—২১৬।

২০। আর্নস্ট হেকেল প্রণীত Die Lebenswunder, Stutgurt 1904 দ্রষ্টব্য।

২১। কার্ল মার্কস, ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্টস্ অফ ১৮৪৪, পৃঃ ১০৮—১০৯।

২২। চার্লস ডারউইন, অরিজিন অফ স্পেসিস্, পৃঃ ১৮৫।

২৩। কালিদাস, কুমারসম্ভব, উত্তর মেঘ, ২১

২৪। ভার্জিল, The Aeneid, Penguin classics, পৃঃ ১০১।

২৫। জি, প্লেখানভ, আর্ট এ্যাণ্ড সোশ্যাল লাইফ, পৃঃ ২৭।

২৬। চার্লস ডারউইন, দি ডিসেন্ট অফ ম্যান, লণ্ডন, ১৮৭৪, পৃঃ ৯৯।

২৭। এঙ্গেলস্, ডায়ালেক্টিস্ অফ নেচার, পৃঃ ২০৫।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম এবং সংস্কৃতি

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প সংস্কৃতির সৃষ্টিতে শ্রমের উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল চরিত্রের পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবার এরই সঙ্গে বৈষয়িক ও মানসিক শ্রমের মধ্যকার সম্পর্কও এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক ও বৈষয়িক উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝতে হলে সর্বোপরি প্রয়োজন শেষোক্ত বিষয়টিকে সাধারণভাবে বিবেচনা না করে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে বিবেচনা করা। যেমন পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন-পদ্ধতির সময়ের মানসিক উৎপাদনের ধরন মধ্যযুগীয় উৎপাদন-পদ্ধতির সময়ের মানসিক উৎপাদনের ধরন থেকে পৃথক। বৈষয়িক উৎপাদনকেই যদি তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে উপলব্ধি করা না যায় তাহলে তার সমকালীন মানসিক উৎপাদনের সঠিক প্রকৃতি এবং বৈষয়িক উৎপাদন ও মানসিক উৎপাদন এই দুইএর আন্তঃক্রিয়াকলাপ বোঝা সম্ভব নয়।

তা ছাড়াও বৈষয়িক উৎপাদনের নির্দিষ্টরূপ থেকে তিনটি জিনিষ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সমাজের একটি নির্দিষ্ট কাঠামো এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক। তাদের রাষ্ট্রের রূপ এবং মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিরূপিত হয় এই দুয়ের দ্বারা। তাদের মানসিক উৎপাদনের প্রকৃতিও সেইরূপ। বৈষয়িক ও মানসিক শ্রমের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে এটাই মার্কসীয় দর্শনের মূল কথা।

দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিভাগ

শ্রম—বৈষয়িক ও মানসিক এই দুই চরিত্রে বিভক্ত হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির সৃষ্টি মানসিক শ্রমের আওতাভুক্ত হয়ে পড়েছে। আদিম মানব সমাজে যে মানুষ পশু শিকার করত আবার সেই মানুষই পর্বত-গুহায় পশুর চিত্রকলা অঙ্কন করত। বৈষয়িক ও মানসিক শ্রমের বিভাগের কোন অস্তিত্ব ঐ সমাজে ছিল না। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে শ্রমিকের পক্ষে স্বাধীনভাবে কোন কিছু করা অসম্ভব। পুঁজিপতির কারখানায় নিছক উপাঙ্গ রূপেই সে তার উৎপাদনের ক্রিয়াকলাপের বিকাশ সাধন করে। শ্রম-বিভাগ কারখানায় শ্রমিককে পুঁজির সম্পত্তিরূপে চিহ্নিত করে দেয়।

পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাবের পূর্বাবস্থায় মধ্যযুগীয় সমাজে কৃষক বা কারিগরের কাছে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার জ্ঞান, বিচার-বুদ্ধি ও অভিপ্রায়ের মূল্য ছিল কারণ এইগুলির প্রয়োগ ছাড়া তার একক ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভব ছিল না। আদিম সমাজেও অনুরূপভাবে মানুষ যখন যুদ্ধে লিপ্ত হত তখন তাকে ব্যক্তিগত বুদ্ধির কসরৎই প্রদর্শন করতে হত। কাজেই ঐ কৃষক, কারিগর, বা যোদ্ধার পক্ষে—যত কমই তার অনুশীলন হোক না কেন—নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করা ব্যতিরেকে তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে এই বুদ্ধিবৃত্তিগুলির প্রয়োজন শুধুমাত্র সমগ্রভাবে কারখানাটারই জন্য। বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য অনেক দিক থেকে লোপ পেয়ে এই উৎপাদন-ব্যবস্থায় কেবল একদিকে বিকাশ লাভ করে। শ্রমবিভাগ শ্রমিকের কাজকে খণ্ডিত করে দিয়ে শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তিগুলিকেও খণ্ডিত করে দেয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে শ্রমিকদের এই হারানো বুদ্ধি-বৃত্তি পরিণামে কেন্দ্রীভূত হয় সেই পুঁজিতে —যে পুঁজি তাদের নিয়োগ করে। অর্থাৎ শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তি যে শুধু অপরের সম্পদে পরিণত হল তাই নয়, সেই হারানো বুদ্ধিবৃত্তি প্রভুশক্তিরূপে শ্রমিকের মুখোমুখিও এসে দাঁড়াল।

সমষ্টিগত শ্রমিককে এবং তার মাধ্যমে পুঁজিকে সামাজিক উৎপাদন শক্তিতে সমৃদ্ধ করার জন্য কারখানা উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রমিকের ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করতেই হবে। কারখানা উৎপাদন গোটা শ্রমিককে কেটে খণ্ড কাজের শ্রমিকে ভাগ করে দেয়। এরই পরিণতি আধুনিক শিল্প। তাই কারখানা-উৎপাদন সবচেয়ে যেখানে সমৃদ্ধিলাভ করে সেইখানে মনের সঙ্গে শ্রমিকের পরামর্শের বালাই সবচেয়ে কম। শ্রম বৈষয়িক ও মানসিক এই চরিত্রে বিভক্ত হয়ে যায় এবং কারখানা-উৎপাদনে এই শ্রম-বিভাগ আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয়। কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনে এর প্রতিক্রিয়া কি? মার্কস এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

'শ্রম-বিভাগ যথার্থই এই রূপ ধারণ করে শুধু সেই মুহূর্ত থেকে যে মুহূর্তে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিভাগ দেখা দেয়। এই মুহূর্ত থেকে চৈতন্য বস্তুতই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে এই ভেবে যে, সে প্রচলিত রীতির চেতনা ছাড়া স্বতন্ত্র অন্য কিছু, এই ভেবে যে, বস্তুতই সে কিছু কল্পনা করেছে যদিও বস্তুতই সে কিছু কল্পনা করে নি। এখন থেকে চৈতন্য নিজেকে পৃথিবী

থেকে মুক্ত করার এবং বিশুদ্ধ তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি প্রণয়নে প্রয়াসী হবার মত অবস্থা লাভ করে। কিন্তু তবুও যদি এই তত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে প্রচলিত সম্পর্কের দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তাহলে তা ঘটতে পারে শুধু এই কারণে যে, প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কগুলির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সম্পর্কের একটা বিশেষ জাতীয় ক্ষেত্রে, জাতীয় পরিসীমার অভ্যন্তরে নয়—কিন্তু এই জাতীয় চেতনা এবং অন্যান্য জাতির রীতির মধ্যে অর্থাৎ কোন জাতির জাতীয় চেতনা ও সাধারণ চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশের মাধ্যমেও এটা ঘটতে পারে।"[১]

শ্রমের দৈহিক ও মানসিক—এই দুইভাগে বিভক্তির ফলশ্রুতি এই দুই প্রকার শ্রমের মধ্যে দ্বন্দ্ব, এর অর্থ মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপের দ্বন্দ্ব। মানব-জাতির অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে এই মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়াকলাপের কোন দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব ছিল না। পুনরায় এই দ্বন্দ্বের অবসানের সম্ভাবনা নিহিত একমাত্র শ্রম বিভাগের তিরোভাবের মধ্যেই। মার্কস বলেছেন,

"তদুপরি চেতনা নিজের খেয়াল খুশিতে কি করতে যাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। এইসব আবর্জনার ভিতর থেকে আমরা এই একটিমাত্র সিদ্ধান্ত পাই যে, এই তিনটি জঙ্গম শক্তি—উৎপাদনের শক্তি, সমাজের অবস্থা এবং চেতনা একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে আসতে পারে এবং অবশ্যই আসবে, শুধু তাই নয়, মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়া-কলাপ, সম্ভোগ ও শ্রম, উৎপাদন ও ভোগ-ব্যবহার বিভিন্ন ব্যক্তি মানুষের উপর বর্তায় এবং তাদের দ্বন্দ্বে না আসার একমাত্র সম্ভাবনা রয়েছে শ্রম বিভাগের তিরোভাবের মধ্যে, তদুপরি এটা স্বতঃ প্রমাণিত যে, 'আধিভৌতিক বস্তু', 'বন্ধন', 'পরম সত্তা', 'প্রত্যয়', 'নীতিবোধ' প্রভৃতি নিছক ভাববাদী আধ্যাত্মিক কথা, স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-মানুষের কল্পনা, সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার শৃঙ্খল ও সীমাবদ্ধতার কল্পরূপ,—এর মধ্যেই চলেছে জীবনের উৎপাদন ক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রূপ।"[২]

এখানে যে বিষয়টি প্রধানতঃ লক্ষণীয় তা হল যে শ্রম-বিভাগের তিরোভাবের মধ্যেই দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিরোধের অবসান নিহিত রয়েছে ঠিকই—কিন্তু এই শ্রম-বিভাগের ফলেই সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর বুকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি। যে দাসপ্রথার কথা স্মরণ করলে বর্তমান যুগের মানুষদের মনে একটা কদর্যতা ও নৈতিক ঘৃণা সৃষ্টি হয়, বাস্তবে সেই দাস-

প্রথার কালেই সর্বপ্রথম মানুষের মধ্যে যে শ্রম বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই শ্রম বিভাগের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু গড়ে উঠেছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতি। দাসপ্রথা বা অনুরূপ প্রথাগুলি কি করে উদ্ভব হল এবং কি করেই বা টিকে ছিল সেই ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যেই এসে পৌঁছতে হয় যে তদানীন্তন অবস্থায় দাস প্রথার প্রবর্তন মানবসমাজে একটি বিরাট অগ্রগতির সূচনাই করেছিল। আসলে মানুষের উৎপত্তি পশু থেকেই এবং তাই বর্বর অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে মানুষকে বন্য ও প্রায় পাশবিক উপায়ই অবলম্বন করতে হয়েছিল। এঙ্গেলস্ এই পরিস্থিতিটাকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'যে প্রাচীন কমিউনে তারা বাস করত, হাজার হাজার বছর ধরে ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত সেগুলিই ছিল অতি বর্বর ধরনের—প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের—ভিত্তি। যেখানেই এই কমিউন ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল সেখানেই মানুষ তাদের উন্নতি সাধন করতে পারল এবং প্রথম অর্থনৈতিক অগ্রগতি হল দাস শ্রমের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন। একথা স্পষ্ট, যতদিন মানুষের শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা এত কম ছিল যে প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উপর অতি অল্পই উদ্বৃত্ত থাকত ততদিন উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, রাষ্ট্র ও আইনের বিকাশ বা শিল্প ও বিজ্ঞানের সূচনা যা কিছুই হোক, সবই সম্ভব হত শুধু মাত্র অধিকতর শ্রমবিভাগ দ্বারাই। এবং এর ভিত্তি হিসাবে প্রয়োজন ছিল বড় রকমের শ্রমবিভাগ এবং স্বল্পসংখ্যক সুবিধাভোগী ব্যক্তি, যারা শ্রম, ব্যবসা ও জনসাধারণের কাজ পরিচালনা করত এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদের শিল্পে ও বিজ্ঞানে নিযুক্ত করেছিল। বস্তুতঃ দাসপ্রথা ছিল এই শ্রমবিভাগের অত্যন্ত সাধারণ ও অতি স্বাভাবিক রূপ।'[৩]

কাজেই দাসপ্রথার মধ্য দিয়ে যে শ্রমবিভাগের সূচনা হল, মানবজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশের সূচনাও হল সেই দাসপ্রথার উপর ভর করেই। প্রকৃত পক্ষে দাসপ্রথা দিয়েই মানবজাতির যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটেছিল তাই সমাজ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিক্রমা করে সমাজতন্ত্রে তার পূর্ণতর বিকাশের পথে অগ্রসরমান। এঙ্গেলস্ তাই আরো বলেছেন, 'দাসপ্রথার ফলেই সর্বপ্রথম কৃষি ও শ্রমশিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভব হয়েছিল এবং তারই সঙ্গে সম্ভব হয়েছিল প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ অবদান গ্রীক ভাবধারা বা গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব। দাসপ্রথা ভিন্ন গ্রীক রাষ্ট্র,

গ্রীক শিল্প ও বিজ্ঞান সম্ভব হত না, সম্ভব হত না রোমান সাম্রাজ্য। আবার গ্রীক ভাবধারা বা গ্রীক সভ্যতা ও রোমান সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ভিন্ন আধুনিক ইউরোপও গড়ে উঠত না। আমরা কখনও যেন না ভুলি যে আমাদের সমগ্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানসিক অগ্রগতি যে অবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সে অবস্থার মধ্যে দাসপ্রথা ছিল যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি সর্বজন-স্বীকৃত। এই অর্থে আমরা বলতে পারি, পুরাকালের দাসপ্রথা ভিন্ন আধুনিক সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়।'[৪]

আসলে মানুষের শ্রমের অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর উৎপাদনশক্তির মধ্যেই শোষক ও শোষিত এবং শাসক ও শাসিত শ্রেণীগুলির ঐতিহাসিক বিরোধের হেতুগুলি নিহিত। সাধারণ মানুষ যারা প্রকৃত মেহনত করে তারা যতদিন তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমকার্যে এমনভাবে ব্যস্ত থাকত যে তাদের পক্ষে আর রাষ্ট্র, আইন, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিগত সাধারণ ব্যাপারে মন দেওয়া সম্ভব হত না, ততদিন এইসব কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য প্রকৃতপক্ষে দৈহিক শ্রমবিমুক্ত একটা বিশেষ শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ শ্রেণী আবার নিজেদের সুবিধার জন্য মেহনতী জনগণের উপর অধিকতর শ্রমের বোঝা চাপিয়ে দিত। দাসপ্রথা থেকে সামন্ততন্ত্র পর্যন্ত সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিভাগ এমনই তীক্ষ্ণ ছিল। ভূমিদাস প্রথাতে ভূমিদাসদের এমনভাবেই জমির কাজের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হত যে তাদের পক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজকর্মে মনোনিবেশ করার কোন অবসরই হত না। ঐ বুদ্ধিবৃত্তিগত কার্যে মনোনিবেশ করা দূরে থাকুক, এমন কি সাধারণ বিদ্যা অর্জন বা শিক্ষালাভও ঐ মেহনতী জনগণের পক্ষে সম্ভব হত না। একমাত্র বৃহৎ শ্রমশিল্পের উদ্ভাবনের পর যখন শ্রমের উৎপাদন শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেল তখনই একমাত্র এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। বৃহৎ শ্রমশিল্পের সৃষ্টি এবং উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির ফলে সমাজের সকল সদস্যদের মধ্যেই শ্রম বণ্টন করা সম্ভব হল, কেউই তা থেকে বাদ গেল না। এর ফলে প্রত্যেক সদস্যের প্রয়োজনীয় শ্রমের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হল যাতে প্রয়োজনীয় শ্রমের বাইরেও সকলেই যেন সমাজের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সাধারণ বিষয়সমূহে অংশ গ্রহণ করতে যথেষ্ট সময় পায়। আর ঠিক 'এই সময় থেকেই শোষক ও শাসকশ্রেণীগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল এবং বাস্তবিক পক্ষে সমাজ-প্রগতির পথে তারা অন্ত-

রায় হয়ে দাঁড়াল। প্রভূত 'প্রত্যক্ষশক্তির' অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা যে নিশ্চিতভাবে বিলুপ্ত হবে, তাও এই সময়ই স্পষ্ট হয়ে উঠল।'[৫] এর আরও যা অর্থ তা হল এই যে এই সময় থেকেই দৈহিক ও মানসিক শ্রম-বিভাগের তিরোভাবের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হয়ে উঠল।

প্রকৃতপক্ষে হস্তশিল্প থেকে শ্রমশিল্পে উত্তরণ এবং তার থেকে আবার বৃহৎ শিল্পে উত্তরণ যে কালের দ্বারা চিহ্নিত, ইতিহাসে সেই কাল ছিল মানুষের মনীষা ও প্রদীপ্ত চিন্তাধারার এক উচ্চতর বিকাশের কাল। প্রাচীনকালের প্রাকৃতিক দার্শনিক প্রোজ্জ্বল চিন্তাধারা এবং আরবদের অতিগুরুত্বপূর্ণ অথচ বিক্ষিপ্ত আবিষ্কারগুলি যখন ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায় হারিয়ে যেতে বসেছিল তখন যে যুগে সেগুলি শুধু পুনরাবিষ্কৃত হল তাই নয়, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানেরও ভিত্তি স্থাপিত হল এবং শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিও এক অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীল উৎকর্ষে পৌঁছাল সে যুগ হল হস্তশিল্প থেকে শ্রমশিল্পে এবং তার পর বৃহৎ শিল্পে উত্তরণের যুগ অথবা আরো পরিচিত ভাষায় সে যুগ হল ফরাসীতে রেনেসাঁ বা জার্মান ভাষায় রিফরমেশন।

পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে এই যুগের আবির্ভাব। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ ঘটল এই সময়েই যখন রাজন্যবর্গ শহুরে মানুষদের সহায়তায় সামন্ত অভিজাতবর্গের শক্তিকে চূর্ণ করে দিয়ে মূলত জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রবল রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন। আধুনিক ইউরোপীয় জাতিসমূহও এই সময়েই গঠিত হল। বাইজেন্টিয়ামের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত হস্তলিখিত দলিলপত্র, রোমের ধ্বংসাবশেষ খনন দ্বারা প্রাপ্ত প্রতি-মূর্তিসমূহ বিস্মিত পাশ্চাত্যের সামনে তুলে ধরল এক নতুন জগৎ, তা হল প্রাচীন গ্রীস। এঙ্গেলসের ভাষায় 'মধ্য যুগের প্রেতের দল এর সমুজ্জ্বল রূপের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল।'[৬] যে ইতালীয় শিল্প সমস্ত উৎকর্ষকে অতিক্রম করে চিরায়ত প্রাচীন রীতির প্রতিচ্ছবি বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই ইতালীয় শিল্পকলার অভাবনীয় সমৃদ্ধি এই যুগেই ঘটেছিল। ইতালী, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে এই যুগেই উদ্ভব ঘটল নতুন সাহিত্যের, সূচনা হল প্রথম আধুনিক সাহিত্যের। মানুষের মনের উপর খৃষ্টীয় যাজকদের একাধিপত্য ভেঙে গেল, স্বাধীন চিন্তার স্বচ্ছন্দ ভাবধারা গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করল এবং অষ্টাদশ শতকের বস্তুবাদের পথ প্রস্তুত হল। পুনরায় এঙ্গেলসের ভাষায়, 'পুরাতন জগতের সীমারেখা অন্তর্হিত হল। এইবারই প্রথম জগৎ ঠিকভাবে আবিষ্কৃত হল।'[৭]

এঙ্গেলস্ আরও বলেছেন, 'আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি হল সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব।'[৮] আর এই যুগেই প্রয়োজন হয়েছিল অসাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল—যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, চরিত্র, সার্বজনীনতা এবং বিদ্যায় অসাধারণ। শেকস্পীয়র, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি থেকে শুরু করে মেকিয়াভেলি পর্যন্ত প্রখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ্‌রা এই সময়ই আবির্ভূত হয়েছিলেন।

এখানে আসল প্রশ্ন হল এই যে, যে দাসসমাজে প্রথম শ্রমবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই দাস সমাজই দিয়েছিল পৃথিবীকে প্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির আস্বাদ। তারপর সেই শ্রমবিভাগই অগ্রসর হতে হতে যখন হস্তশিল্পে এবং বৃহৎশিল্পে উত্তরণের স্তরে এসে পৌঁছাল ঠিক তখনই সংগঠিত হল সেই পর্যন্ত 'সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব'। শ্রমবিভাগের বিকাশ এবং শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এই বিপ্লব সম্ভব হত না। শিল্প-সংস্কৃতি এবং সৌন্দর্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে এই যুগ ছিল মানব ইতিহাসের স্বর্ণযুগ।

কিন্তু এটা ছিল একটা যুগসন্ধিক্ষণ। এই যুগই গর্ভে ধারণ করল ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলল শিল্প বিপ্লবের যুগ, আর এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখানে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। রেনেসাঁ যুগে যে শ্রমবিভাগ ছিল তার তুলনায় পরিপূর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজে সেই শ্রমবিভাগ সাংঘাতিক ধরনের তীক্ষ্ণরূপ ধারণ করল এবং শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধকারী ফলাফলও প্রকট হয়ে উঠল। রেনেসাঁ যুগের প্রতিভাধরদের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তাঁরা প্রায় সকলেই সমসাময়িক আন্দোলন তথা সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তাঁদের জীবনযাত্রা ও কর্মধারা পরিচালনা করতেন। তাঁরা নিভৃতে থাকার মানুষ ছিলেন না। তাঁরা পক্ষ গ্রহণ করতেন, কেউ বক্তৃতা ও লেখার সাহায্যে, কেউ বা তরবারির সাহায্যে, আবার অনেকে উভয়ের সাহায্যেই লড়াই চালাতেন। এর থেকে এসেছিল তাঁদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও বল যা তাঁদের পরিপূর্ণ মানুষ করে তুলেছিল। কিন্তু পুরোদস্তুর ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পর এই অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন ঘটল। শ্রমবিভাগ মারাত্মকরূপ ধারণ করল। শ্রমিককে যন্ত্রের নাট-বল্টুতে পরিণত করল, তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে খণ্ডিত করে দিল, এক অমানবিক প্রভাব শ্রমিককে খণ্ড মানুষের স্তরে উপনীত করল। দুটি সামাজিক শ্রেণীর

সৃষ্টি হয়—একটি বুর্জোয়া শ্রেণী যারা সমস্ত কলকারখানা ও উৎপাদনের উপায়-সমূহের মালিকানা লাভ করল এবং আরেকটি সর্বহারা অর্থাৎ, মজুরি-শ্রমিক যারা উৎপাদন করল অথচ উৎপাদনের উপায়সমূহ লাভ করল না। উপরন্তু তারা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর অমানুষিক শোষণের শিকার—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যারা ভারবাহী পশুর মত পরিশ্রম করতে বাধ্য হল পুঁজিপতির মুনাফার স্বার্থে। শুরু হল পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টির যুগ—যে যুগের বৈশিষ্ট্য হল শিল্প-সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের প্রতি বৈরীভাব। শ্রমবিভাগের এই মারাত্মক তীব্রতার যুগে শুরু হল মানুষের শিল্প-প্রতিভার অধোগতি ও সংস্কৃতির অবক্ষয়।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রম

মার্কস তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'থিয়োরিজ অব সারপ্লাজ ভ্যালু'তে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সেই ব্যাখ্যার নির্যাস হিসাবে বলা যায়,

'ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে তাই উৎপাদনশীল শ্রম হচ্ছে সেই শ্রম যা তার মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে অথবা যা শ্রমের বস্তুগত অবস্থাকে পুঁজিতে এবং তার মালিককে পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করে; অর্থাৎ সেই শ্রম যা নিজের উৎপাদনকে পুঁজি হিসাবে উৎপাদন করে।'[২]

পুঁজিবাদী উৎপাদনে মজুরি-শ্রমিক মালিকের জন্য শ্রম করে এবং বিনিময়ে মজুরি পায়। কিন্তু তার মজুরি-শ্রম যা উৎপাদন করে তা শুধু তার মজুরিই নয়। মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্যও। অর্থাৎ মজুরি-শ্রম মালিকের পুঁজি সৃষ্টি করে, নিজের মজুরির ও অধিক মূল্য সে সৃষ্টি করে। এই মজুরি-শ্রমই উৎপাদনশীল শ্রম। অপর পক্ষে যে শ্রম কোন পুঁজি সৃষ্টি বা উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে না—তা-ই হচ্ছে অনুৎপাদনশীল শ্রম। একজন পুঁজিপতির কারখানায় যে শ্রমিক শ্রম করে সে পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। তাই পুঁজিপতির কাছে সেই শ্রম উৎপাদনশীল শ্রম। আবার যে দর্জি পুঁজিপতির পোশাক পরিচ্ছদ তৈরি করে সে পুঁজিপতির জন্য ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সেই শ্রম পুঁজিপতির জন্য কোন উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না। পুঁজিপতি উভয়কেই মজুরি দেয়, কিন্তু প্রথমোক্ত শ্রম পুঁজিপতির কাছে উৎপাদনশীল এবং শেষোক্ত শ্রম অনুৎপাদনশীল, আবার কোন মালিক যদি একটা দর্জির কারখানা স্থাপন ক'রে ব্যাপক ভাবে পোশাক পরিচ্ছদ

তৈরি করে তা বিক্রয়ের জন্য, তবে সেই দর্জির শ্রম সেই মালিকের কাছে উৎপাদনশীল শ্রম, কারণ ঐ শ্রম মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে। পুঁজিপতি এ ক্ষেত্রে দর্জিকে যে মজুরি দেয় দর্জির শ্রম তদপেক্ষা অধিক মূল্য উৎপাদন করে—অর্থাৎ দর্জি পুঁজি সৃষ্টি করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিল্প-সংস্কৃতি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও শ্রমের ঐ উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ সেই উৎপাদন বা সেই সৃষ্টিতেই আগ্রহী যা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে, যা পুঁজি সৃষ্টি করে।

আসলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বা অনুৎপাদনশীলতার এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হচ্ছে উৎপাদনের নির্দিষ্ট সামাজিক রূপ বা সামাজিক সম্পর্কের উপরই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থায় এই ব্যাখা শ্রমের বৈষয়িক চরিত্রের উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। শ্রমিকের শ্রমের নির্দিষ্ট রূপ কি বা শ্রমের উৎপাদনেরই বা বৈশিষ্ট্য কি এই সব প্রশ্নের উপরে উৎপাদনশীলতা নির্ভরশীল নয়, এখানে একটা বৈশিষ্ট্যই গ্রাহ্য—তা হচ্ছে সেই শ্রম মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে কিনা। 'উদাহরণস্বরূপ, একজন অভিনেতা অথবা এমনকি একজন ভাঁড়ও এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উৎপাদনশীল শ্রমিক যদি সে পুঁজিপতির (নিয়োগ কর্তার) সেবায় শ্রম করে, মজুরি হিসাবে সে যা পায় তার কাছ থেকে তদপেক্ষা অধিক শ্রম সে তাকে ফেরৎ দেয়। আবার একজন ঠিকা দর্জি যে পুঁজিপতির বাড়িতে এসে তার ট্রাউজার সেলাই করে দেয় সে শুধু পুঁজিপতির জন্য ব্যবহারিক মূল্য উৎপাদন করে এবং সে হচ্ছে অনুৎপাদনশীল শ্রমিক। প্রথমোক্তের শ্রম পুঁজির সঙ্গে বিনিময় হয়, শেষোক্তের শ্রম হয় আয়ের সঙ্গে। প্রথমোক্তের শ্রম উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, শেষোক্তের শ্রম আয় ক্ষয় করে ফেলে'[১০]

কাজেই শ্রমের নির্দিষ্ট রূপ উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করে না, তা নির্নীত হয় উৎপাদনব্যবস্থায় কি নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোতে ঐ শ্রম, এবং তা যে কোন ধরনের শ্রমই হোক না কেন, প্রদান করা হল। এই নিরিখে একজন অভিনেতার অভিনয় বা একজন ভাঁড়ের ভাঁড়ামিও উৎপাদনশীল শ্রম বলে পরিগণিত হতে পারে। মার্কস আরও উদাহরণ দিয়েছেন, 'একজন লেখক উৎপাদনশীল শ্রমিক এই অর্থে নয় যে সে ভাব সৃষ্টি করে, উপরন্তু এই অর্থেই যে, যে প্রকাশক তার লেখা প্রকাশ করে সেই প্রকাশকের ধন সে বৃদ্ধি করে, অথবা যদি সে পুঁজিপতির নিকট একজন মজুরি শ্রমিক হয়।''[১১]

উৎপাদনশীল শ্রমিকের শ্রম কোন পণ্যের যে ব্যবহারিক-মূল্য উৎপাদন করেছে তা নিতান্ত তুচ্ছ হতে পারে, শ্রমের বৈষয়িক বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে আদৌ বিচার্য নয়। উৎপাদনের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামোর নিরিখেই এই শ্রম বিবেচ্য।

ঠিক এই নিরিখেই 'একজন গায়িকা যে তার নিজের উপার্জনের জন্য তার সঙ্গীত বিক্রয় করে সে একজন অনুৎপাদনশীল শ্রমিক। কিন্তু ঐ একই গায়িকা যদি যদি কোন ব্যবসায়ীর দ্বারা বেতনভুক হিসাবে নিযুক্ত হয়ে তার অর্থ উপার্জনের জন্য গান করে তবে সে উৎপাদনশীল শ্রমিক কারন তখন সে পুঁজি উৎপাদন করে।'[১২]

তাই শিল্প-সংস্কৃতির সৃষ্টি উৎপাদনের নির্দিষ্ট সামাজিক কাঠামো-নিরপেক্ষ হতে পারে না। যেহেতু ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল অথবা আরও সহজ ভাষায় মুনাফা ও অর্থ অর্জনই যে সমাজের লক্ষ্য সেই সমাজে শিল্প-সংস্কৃতি সৃষ্টির কোন স্বচ্ছন্দ গতি সম্ভব নয়। এই সৃষ্টি নির্ভর করবে তা কতটা পরিমাণে মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলশ্রুতি যা দাঁড়ায় তা হল এই যে পুঁজিবাদী সমাজে শিল্পের উৎকর্ষের উপর সেই শিল্পের স্থায়িত্ব নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে সেই শিল্প কোন পুঁজিপতির জন্য কতটা উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে পারে।

এখানে তাই যে বিষয়টি বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য তা হল বৈষয়িক উৎপাদন ও আত্মিক উৎপাদনের পারস্পরিক ক্রিয়াশীলতা। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বৈষয়িক শ্রমের বিভাগই হল মানসিক শ্রমবিভাগের পূর্বশর্ত। এই নিরিখ থেকেই মার্কস মন্তব্য করেছেন, 'আত্মিক উৎপাদন ও বৈষয়িক উৎপাদনের সম্পর্ক বিচার করতে গেলে সর্বোপরি প্রয়োজন শেষোক্ত বিষয়টিকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হিসাবে না দেখে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাঠামোতে উপলব্ধি করা। সেই অনুযায়ী উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের আত্মিক উৎপাদন কোনটা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি এবং কোনটা মধ্যযুগীয় উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি বৈষয়িক উৎপাদনকে তার সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে উপলব্ধি করা না যায় তবে তার অনুরূপ কাঠামোতে উৎপাদিত আত্মিক উৎপাদনেরও বৈশিষ্ট্য এবং উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। অন্যথায় অর্থহীনতাকে অতিক্রম করা যাবে না।'[১৩]

মধ্যযুগের শিল্পে মধ্যযুগের উৎপাদন পদ্ধতির ছাপ, তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজের শিল্পে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ছাপ বিদ্যমান। বৈষয়িক উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট রূপ থেকেই উদ্ভূত হয় একটা নির্দিষ্ট সমাজের কাঠামো এবং তারই সঙ্গে নির্ধারিত হয় মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। আর এই দুইএর উপরই নির্ভর করে মানুষের আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার আত্মিক উৎপাদন।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি মুনাফাভিত্তিক, তাই যে উৎপাদন মুনাফা সৃষ্টিতে অক্ষম বা দুর্বল সেই উৎপাদনের প্রতি ধনতান্ত্রিক সমাজ বৈরী মনোভাবাপন্ন। মহত্তম শিল্প সৃষ্টি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের কাছে অর্থহীন কারণ ঐ শিল্প অর্থকরী নয়। তাই পুঁজিবাদী সমাজে মহত্তম শিল্প সৃষ্টির কোন প্রেরণা নেই। মার্কস তাই বলেছেন, "পুঁজিবাদী উৎপাদন আত্মিক উৎপাদনের কয়েকটি শাখা যেমন, শিল্পকলা ও কবিতার প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন। যদি এটা বিচারের বাইরে রাখা হয় তবে লেসিং যাদের খুব সুন্দরভাবে বিদ্রূপ করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই ফরাসীদের মত ভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যেহেতু আমরা প্রাচীনদের তুলনায় যন্ত্রবিদ্যায় অনেক এগিয়ে আছি অতএব আমরাই বা একটা মহাকাব্য রচনা করতে পারব না কেন? এবং ইলিয়ডের স্থলে হেনরিয়াড!"[১৪]

বস্তুতঃ বিভিন্নযুগের সমাজ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে সেই যুগের শিল্প সংস্কৃতি। যে যুগে উৎপাদন-পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের সেই যুগের শিল্প-সংস্কৃতিও ছিল সেইস্তরের উপযুক্ত ভাবনাসঞ্জাত। আবার যে যুগে উৎপাদন-পদ্ধতি উন্নত স্তরে পৌঁছেছে সেখানে সংস্কৃতি-ভাবনাও রূপ নিয়েছে তদনুরূপ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতবর্ষের রামায়ণ ও মহাভারতের শিল্পকৃতি এবং সেই যুগের সমাজ-সম্পর্ক ও উৎপাদন-পদ্ধতির বিষয়টি। রামায়ণে মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করেছেন, মহাভারতে যুধিষ্ঠির সশরীরে স্বর্গারোহণ করেছেন। কিন্তু আজকের যুগে রামায়ণ ও মহাভারতের এই ধরনের কল্পনাসঞ্জাত শিল্পকৃতি আদৌ সম্ভব কি? সম্ভব নয় এই কারণেই যে এই শিল্প-ভাবনার সঙ্গে আধুনিক পুঁজিবাদী যুগের উৎপাদন-পদ্ধতির কোন সম্পর্ক নেই এবং তাই ঐ ধরনের কল্পনাসঞ্জাত কোন সাহিত্য যদি সৃষ্টিও হয় তাহলে তা এতই অবাস্তব, অলীক ও শিশুসুলভ বলে বিবেচিত হবে যার সঙ্গে আজকের উন্নত উৎপাদন-পদ্ধতি

থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিগত ভাবনা-চিন্তার কোন সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মার্কস বিষয়টিকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। উৎপাদন-পদ্ধতির উপর শিল্প বিকাশের নির্ভরতাকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন,

'গ্রীক পুরাকাহিনী কেবল গ্রীক শিল্পকৃতির সংগ্রহ মাত্র নয়, উৎসও বটে। প্রকৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রীকদের কল্পনা ও শিল্পকৃতিকে রূপদান করেছিল তা কি আজকের এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, রেলগাড়ি আর টেলি-গ্রাফের যুগে সম্ভব? রবার্ট'স্ এণ্ড কোম্পানীতে ভাল্‌কানের স্থান কোথায়, মহাজনের পাশে হার্সে'লের? গ্রীক শিল্পকৃতির পূর্বশর্ত হল গ্রীক পুরাণের কাহিনী; প্রকৃতি ও সমাজ যেখানে মানুষের কল্পনায় তার অজ্ঞাতেই শিল্প-সুষমায় সুগঠিত। মিশরের পুরাকাহিনীর জঠরে কখনও গ্রীক শিল্পের জন্ম হতে পারে না। অবশ্য পুরাকাহিনী ছাড়া গ্রীকশিল্প সম্ভব নয়। প্রকৃতি সম্পর্কে পৌরাণিক ব্যাখ্যা, পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে প্রত্যাখ্যাত সেখানে কোন ক্রমেই গ্রীক শিল্পকৃতি সম্ভব নয়।

'বিষয়টিকে আর এক দিক থেকে দেখা যাক। গোলাবারুদের যুগে একিলিস্ সম্ভব কি? কিম্বা মুদ্রাযন্ত্রের যুগের সঙ্গে ইলিয়ড খাপ খায় কি? মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে ভাটগান, আবৃত্তি আর বাণী ও সুর দেবীদের কি তিরোভাব ঘটেনি?—আর সেই সঙ্গে কি তিরোভাব ঘটেনি মহাকাব্যের পূর্ব শর্ত সমূহের?'[১৫]

এইসব শিল্প সাহিত্যের যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন সেই স্রষ্টাব' তাঁদের কিছু পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা আর্থিক দিক দিয়ে চালিত হতেন। তাঁদের দেয় সেই অর্থ প্রতুল কি অপ্রতুল ছিল সেটা এখানে প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা এই যে উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বিশেষ বিকাশের যুগে, সেই যুগের ভাবনা-কল্পনা অনুযায়ী এরা শিল্প সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং সেই রচনা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী রচিত হয় নি। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর শিল্প সৃষ্টি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন রীতিতে হয় নি, তাই শ্রমের উৎপাদনশীলতার নিরিখে সেই শিল্প বিচার্য হয় নি। পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হয়ে শিল্পী আপন মনে সৃষ্টি করেছিলেন, ঐ সৃষ্টি কতটা মুনাফা বা উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে আসবে তা সেখানে বিবেচ্য ছিল না। তাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বিকাশ ঘটবার সুযোগ সেখানে হয়েছিল, তার শিল্প হয়েছিল রসোত্তীর্ণ, লাভ করেছিল এক সুন্দরতম পরিণতি।

ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিভার দিকেও দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে রসোত্তীর্ণ চিরায়ত সাহিত্য যে যুগে সৃষ্টি হয়েছিল সেই যুগ ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের যুগ নয়। কবি কালিদাস ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় রাজকবি। রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি শিল্প সৃষ্টি করতেন। সেই শিল্পসৃষ্টিতে উদ্বৃত্তমূল্য উৎপাদনের প্রশ্ন ছিল না। হয়তো রাজার পছন্দ, অপছন্দ, বা রুচি, অরুচির প্রশ্ন সেখানে কিছুটা ছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সৃষ্টি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন কাঠামোতে হয় নি। তাই শিল্প বিচারে দেখা যাবে কালিদাসের শিল্প ছিল মহৎ সৃষ্টি। মেঘদূতের কল্পনা, বিরহী যক্ষ তার প্রিয়ার কাছে মেঘের মারফৎ তার যে বিরহবেদনা প্রেরণ করছে—এ হয়তো এ যুগে অচল, কিন্তু ঐ কল্পনা ছিল ঐ যুগের উৎপাদন-পদ্ধতি ও তৎসঞ্জাত চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সব মিলিয়ে শিল্প হয়েছিল মহৎ। কালিদাসের অন্যান্য কাব্য সম্পর্কেও একই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। যেমন প্রাচীন যুগে, তেমনি মধ্যযুগে আকবরের রাজসভায় কবি বীরবলের অধিষ্ঠান ও তার কাব্যকৃতি থেকে শুরু করে এমনি আরও অসংখ্য উদাহরণ মিলবে যেখানে শিল্পসৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন ধনীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায়—কোন মুনাফা অর্জনের তাগিদে নয়।

কি ইউরোপে বা কি ভারতবর্ষে এই পৃষ্ঠপোষকরাই এই সমস্ত শিল্পের মালিকানা লাভ করত ঠিকই এবং তার পরিবর্তে তাঁরা শিল্পীকে আর্থিক সাহায্য করত, কিন্তু ঐ পৃষ্ঠপোষকরা ঐ শিল্পকে কোন মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহার করে নি। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষ হয়ত কোন শিল্পীর কাছ থেকে তাঁর শিল্পকৃতি অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিত এবং এমন কি এইসব ক্ষেত্রেও ঐ ক্রেতা ঐ শিল্পকে আবার বেচা-কেনা করে মুনাফা অর্জনের কোন চেষ্টা করত না। অর্থনীতির বিচারে এ কথাই বলা যায় যে এই সমস্ত ক্ষেত্রেই শিল্পী একটা ব্যবহারিক মূল্য উৎপাদন করত। যে ব্যবহারিক মূল্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মানুষের একটা চাহিদা পূরণ করত।

ফলে যে ব্যক্তি ঐ শিল্পকার্য সংগ্রহ করত সে শিল্পীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট গুণসম্পন্ন একটা সৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করত। ঐ সামগ্রীতে থাকত একটা মূর্ত গুণগত শ্রম এবং তার থেকে উদ্ভূত একটা ব্যবহারিক মূল্য। কিন্তু উৎপাদক ও মালিকের এই সরাসরি সম্পর্কে শিল্পকার্যটি কোন বাজারের মধ্য দিয়ে আসে নি, তা কোন পণ্যে রূপান্তরিত হয় নি। যে ব্যক্তি ঐ শিল্পকার্য সংগ্রহ

করত সে এই চিন্তা করত না যে, যে মূল্যে সে ঐ শিল্পকার্য সংগ্রহ করেছে তদপেক্ষা অধিক মূল্যে সেটিকে সে আবার বিনিময় করবে। সংগ্রহকারীর এখানে একটাই আকর্ষণ ছিল, তা হচ্ছে ঐ শিল্পের ব্যবহারিক মূল্য, যে ব্যবহারিক মূল্য শিল্পী ঐ শিল্পের মধ্যে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু এই শিল্পকার্য যার মূল্য তার ব্যবহারিক মূল্যের অধিক নয় এবং যা অপরের জন্য কোন অধিকতর মূল্য সৃষ্টি করে না অর্থাৎ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে না, তা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিচারে অনুৎপাদনশীল শ্রম।

বস্তুতঃ যতক্ষণ শিল্পী কেবলমাত্র ব্যবহারিক মূল্য উৎপাদন করে, যে মূল্য একমাত্র তার মানবিক প্রয়োজনে এবং মানুষের ভাবের প্রকাশ ও আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ততক্ষণ সেই শিল্প অনুৎপাদনশীল শ্রম। এই শ্রম অবশ্যই উৎপাদক এবং ব্যবহারকারী উভয়কেই মানসিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে, তা সত্ত্বেও এই শ্রম অনুৎপাদনশীল কারণ তা সেই শিল্পের মালিককে উদ্বৃত্ত মূল্য যোগায় না। এই নিরিখে পুঁজিপতির কাছে সেইটাই উৎপাদনশীলতা যাতে পুঁজিপতি নির্দিষ্ট মানবিক শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট একটা নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে তার দ্বারা উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করতে পারে। তাই যদিও শিল্পীর শ্রম একটা নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করে সৌন্দর্য, আনন্দ, আবেগ ও কল্পনা তবুও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে এই শ্রমই হয়ে ওঠে উৎপাদনশীল যখন সেই শ্রম পুঁজিপতির জন্য নিয়ে আসতে পারে উদ্বৃত্তমূল্য। এই দৃষ্টিতে শিল্পীর সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী শ্রমও পুঁজিপতির কাছে হয়ে ওঠে উৎপাদনশীল শ্রম।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যখন বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছায় তখন শিল্প-সৃষ্টিকে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অঙ্গীভূত করারও একটা ঝোঁক সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে শিল্পকলার সৌন্দর্য সৃষ্টির স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ গতির রয়েছে একটা অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং তার ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে শিল্পের বিমিশ্রণের সব সময়েই থাকে একটা প্রতিবন্ধকতা। তাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মৌল নিয়ম শিল্পকলার কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই মাত্র অনুভূত হয় এবং বহু ক্ষেত্রেই অনুভূত হয় একটা বিরোধ।

অমানবিককরণে অর্থের ক্ষমতা

সৌন্দর্য, আবেগ, অতিরাগ ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যেই শিল্পের সার্থকতা।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির মৌল নিয়ম শিল্প-সৃষ্টির এই মহত্ত্বেরই বিরোধিতা করে। মার্কস বলেছেন,

"মানুষের আবেগ, অতিরাগ ইত্যাদি সংকীর্ণ অর্থে নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞামাত্র নয়; এগুলি তার প্রকৃতির বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের স্বীকৃতি; এই সব স্বীকৃতি থেকে কেবল একথাই প্রমাণিত হয় যে এই আবেগ, অতিরাগ ইত্যাদির বিষয়ীভূত ঘটনাগুলি এদের উপলব্ধিগোচর :—একথা যদি সত্য হয় তাহলে দেখা যায় :

"(১) এদের স্বীকৃতির পদ্ধতি কখনও এক ও অভিন্ন নয়; পক্ষান্তরে স্বীকৃতির স্বতন্ত্র পদ্ধতিই এদের অস্তিত্বের এবং জীবনের বৈশিষ্ট্য। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মত এই পদ্ধতিও এদের ভোগের বিশিষ্ট পদ্ধতি।

"(২) যেখানে ইন্দ্রিয়ানুভূতিসঞ্জাত স্বীকৃতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাক্ষাৎ বিলুপ্তি ঘটে (যেমন ভোজন, পান ইত্যাদি) সেখানে সেটাই হল বিষয়ের স্বীকৃতি।

"(৩) মানুষ মানবিক, সুতরাং তার ভাবাবেগ প্রভৃতিও মানবিক। অপর একটি বিষয়ের দ্বারা বিষয়টির স্বীকৃতিও তেমনি তার নিজেরই ভোগ।

"(৪) শিল্পের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মাধ্যমে শিল্প গড়ে না ওঠা পর্যন্ত মানুষের ভাবাবেগের মূলোপাদানগত প্রকৃতি সামগ্রিকতা ও মানবিকতা পায় নি; সুতরাং মানুষের বিজ্ঞানও মানুষের ব্যবহারিক আত্মক্রিয়াকলাপের উৎপন্ন ফল।

"(৫) উচ্ছেদমুক্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তির বোধ হচ্ছে, উপভোগের বিষয় এবং ক্রিয়াকলাপের বিষয়—এই উভয়রূপে মানুষের অত্যাবশ্যক বিষয়সমূহের অস্তিত্ব।"[১৬]

মানুষের আবেগ, অতিরাগ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি যে ভাবানুভূতিগুলি সংকীর্ণ অর্থে নৃতাত্ত্বিক সংজ্ঞামাত্র নয় এবং যেগুলির স্বীকৃতির বিভিন্ন পদ্ধতিই এদের অস্তিত্বের এবং জীবনের বৈশিষ্ট্য, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো সেই সূক্ষ্ম ভাবানুভূতিগুলিকেই অর্থের অধীন করে ফেলার প্রচেষ্টা করে। অর্থের মূল্যে যার বিচার হয় না, শিল্পোৎকর্ষ যার বিচারের একমাত্র মূল্য, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি তাকেই বিচার করে কাঞ্চন মূল্যে। মার্কস তাই বিশ্লেষণ করেছেন, যেহেতু অর্থ সব কিছু ক্রয়ের গুণ ধারণ করে, যেহেতু সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করার গুণ তার রয়েছে সেইহেতু অর্থ নিজেই মহামূল্য বিষয়। এ

গুণের সর্বজনীনত্ব হচ্ছে এর মর্মবস্তুর অন্তহীন শক্তি। সুতরাং অর্থ সর্বশক্তিময় মর্মবস্তুরূপে কাজ করে। অর্থ প্রয়োজন ও প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে মাধ্যম, মানুষের জীবন এবং তার খাদ্যের মধ্যে মাধ্যম। ঠিক সেইভাবেই অর্থ আবার মানুষ এবং শিল্পকলার মধ্যেও মাধ্যম। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থের এই সর্ব-শক্তিমানতার বিশ্লেষণ করতে যেয়ে মার্কস্ শেকস্পীয়রের কাব্যের উল্লেখ করেছেন। শেকস্পীয়র ছিলেন এমন এক যুগের শিল্পী যে যুগ হচ্ছে মধ্যযুগের অবসান ও ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ের এক মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল। শেকস্পীয়র তাঁর সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি দিয়ে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন অর্থের এই সর্বময়তা। শেকস্পীয়রের কাব্যকৃতি এই জন্যই মহৎ যে, সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তার যুগকেও তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন তাঁর সাহিত্যে। অর্থের এই সর্বময়তার উপলব্ধি তাই শেকস্পীয়রের তীক্ষ্ণ সমাজ চেতনারই পরিচায়ক। শেকস্পীয়র তাঁর 'টাইমন অব এথেন্স' নামক নাটকে অর্থের এই সর্বময়তাকে অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন (বঙ্গানুবাদ),

সোনা। হলদে চকচকে মহামূল্য সোনা!
দোহাই দেবতারা, আমায় ভেবনা নেহাৎ চাটুকার।
সোনা কালোকে সাদা করে; মন্দকে ভাল; ভুলকে ঠিক;
নিচুকে উঁচু, বুড়োকে জোয়ান; ভীরুকে বীর;
—আর শুধু কি তাই? সোনা তোমাদের কাছ থেকে
ছিনিয়ে নেয় ভক্ত আর পূজারীদের; কেড়ে নেয়
বীরপুরুষদের চোখের ঘুম।
সোনা—এই হলদে রঙের নফর—ধর্ম ভাঙে গড়ে
ঘৃণার্হকে করে পূজার্হ; কুষ্ঠ রোগীকে করে
ইষ্টপুরুষ; চোরদের ভূষিত করে উপাধিতে,
আসন দেয় মানী লোকের পাশে; বিধবাদের দেয়
বিবাহের অধিকার;
অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পায় না যে অনারোগ্য রোগী,
তার দেহে এ দেয় শান্তির প্রলেপ!
তবে এসো, নিখিল মানুষের বারবনিতা,
জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ বহ্নির ইন্ধন

সর্বনাশা ধাতুপিণ্ড, তবে এসো......[১৭]

ঐ নাটকের আরও একজায়গায় শেকস্‌পীয়র সুন্দরভাবে লিখেছেন,

মহারাজের তুমি মধুর মরণ !
অবৈধ জনক জাতকের মহার্ঘ বিচ্ছেদ !
প্রজাপতির পবিত্র শয়নে কলংকের উজ্জ্বল সায়ক !
তুমি বীর রণদেবতা !
তুমি চির তরুণ, চির রঙীন, প্রণয়ভাষণে চির-মুখর।
ডায়ানের কোলে জমে থাকে যে পবিত্র তুষার
তোমার অরুণ রাগে তা হয় বিগলিত।
তুমি দৃশ্যমান দেবতা।
অসম্ভবকে তুমি সম্ভব কর, বিরহকে মিলন !
নানা স্বার্থে নানা ভাষায় তুমি কথা বল।
অন্তরের তুমি অন্তরতম !
মানুষকে তুমি করে তোল বিদ্রোহী,
ছুঁড়ে ফেল বিশৃংখল বিভ্রান্তিতে,
পৃথিবী পরিণত হয় জানোয়ারের রাজ্যে।[১৮]

শেকস্‌পীয়র খুব চমৎকারভাবেই অর্থের মর্মবস্তু বর্ণনা করেছেন। শোষণ-ভিত্তিক সমাজে অর্থের এমনই শক্তি যে সে ঘৃণ্যকে পূজ্য করে, কুৎসিৎকে করে সুন্দর, নিন্দার্হদের করে প্রশংসিত। অর্থ পরিদৃশ্যমান ঈশ্বর, সকল মানবিক গুণকে বিপরীত বস্তুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। অর্থ সর্বজনের বারবনিতা, ব্যক্তি মানুষ ও সমষ্টি মানুষের পক্ষে সবকিছুর বারোয়ারী দালাল।

সমস্ত মানবিক ও প্রাকৃতিক গুণের রূপান্তরকরণ, পরিবর্তনসাধন, বিপরীতের মিলন সাধন—অর্থের বিদ্যমান এই ঈশ্বরসুলভ ক্ষমতা মানবিকতাকে করে তোলে বিবস্ত্র, পৃথিবীকে পরিণত করে জানোয়ারের রাজ্যে।

মার্কস তাই বলেছেন, ‘এই রূপান্তরকারী শক্তি হিসাবে অর্থ ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধে এবং সামাজিক ও অন্যান্য যে সব বন্ধন অত্যাবশ্যক বলে দাবি রাখে তার বিরুদ্ধেও নিজেকে প্রকাশ করে। আনুগত্যকে আনুগত্যহীনতায়, প্রেমকে ঘৃণায়, ঘৃণাকে প্রেমে, গুণকে দোষে, দোষকে গুণে, দাসকে প্রভুতে, প্রভুকে দাসে, বুদ্ধিকে মূর্খতায়, মূর্খতাকে বুদ্ধিতে পরিণত করে।’[১৯]

তাই অর্থই হল রূপান্তরিত জগৎ, সকল মানবিক ও প্রাকৃতিক গুণের

রূপান্তর সাধক ও বিনিময় কারক। যে সমাজে এই সর্বশক্তিমান অর্থেরই একাধিপত্য সেই সমাজে শিল্প-কলার সূক্ষ্ম ভাবানুভূতি, সৌন্দর্য, অনাবিল আনন্দ প্রভৃতি সব শিল্পগুণই যখন অর্থের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তখন সেই শিল্পগুণ আর শিল্পগুণ হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না—মুদ্রা-মূল্যে তার অবসান ঘটে।

শোষণভিত্তিক সমাজে অর্থের নিরিখে তাই মিল্টনের শিল্পকৃতিও অনুৎপাদনশীল শ্রম। কিন্তু যে লেখক মানুষের স্থূল চিত্ত বিনোদনের জন্য সাহিত্য রচনা করে এবং সেই সাহিত্য বিক্রয় করে যদি প্রকাশকের মুনাফা হয় তবে সেই লেখকের শ্রম বিবেচিত হবে উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে। অর্থাৎ শ্রমের একইরূপ সাহিত্য রচনা—কোনক্ষেত্রে উৎপাদনশীল আবার কোন ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল। মার্কস তাই বলেছেন,

'উদাহরণস্বরূপ মিল্টন যিনি প্যারাডাইস লস্ট লিখেছিলেন পাঁচ পাউণ্ডের জন্য তিনি ছিলেন অনুৎপাদনশীল শ্রমিক। অপরদিকে যে লেখক তার প্রকাশকের জন্য কারখানার কায়দায় স্থূল জিনিষ উৎপাদন করে সে উৎপাদনশীল শ্রমিক। মিল্টন প্যারাডাইস লস্ট রচনা করেছিলেন সেই কারণে যে কারণে রেশম পোকা রেশম উৎপাদন করে। এটা ছিল তার প্রকৃতিগত কর্ম। পরে তিনি তা পাঁচ পাউণ্ডে বিক্রয় করেন। কিন্তু লাইপজিগের সাহিত্যিক সর্বহারা যে তার প্রকাশকের নির্দেশে পুস্তক উৎপাদন করে (উদাহরণস্বরূপ, কম্পেণ্ডিয়া অব ইকনমিক্স্) সে একজন উৎপাদনশীল শ্রমিক, কারণ শুরু থেকেই তার সৃষ্টবস্তু হচ্ছে একটা ঘনীভূত পুঁজি এবং তার সৃষ্টিই হয় পুঁজিকে বৃদ্ধির জন্য।'[২০]

পুঁজিবাদী সমাজে শিল্প-সংস্কৃতির অবনমনের কারণ মার্কস অতি চমৎকার-ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সৃষ্টিই যেখানে শিল্পসৃষ্টিরও নিরিখ, সেখানে মহৎ শিল্প-সৃষ্টির সুযোগ নিতান্তই সীমিত। আর মহৎ শিল্প সৃষ্টি যেখানে সম্ভব হয় না সেখানে শিল্প-কলার স্থূলতাই হয় উৎসাহিত। এর যা আনুষাঙ্গিক তা হচ্ছে সূক্ষ্ম শিল্প-সংস্কৃতিমনা মানুষেরও অভাব এবং তার যা পরিণতি তা হল মহত্তম শিল্প-সংস্কৃতির পরিবর্তে ভাবজগতে ঢালাওভাবে স্থূলতার সৃষ্টি—সংস্কৃতির গুরুতর অবনমন বা অপসংস্কৃতির প্রসার—পৃথিবীকে অমানবিকতার রাজ্যে পরিণত করণ।

১। মার্কস্, দি জার্মান ইডিওলজি, মার্কস-এঙ্গেলস্ কালেক্টেড ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড পৃঃ ৪৪—৪৫।
২। ঐ পৃঃ ৪৫।
৩। এঙ্গেলস্, এ্যান্টি ড্যুরিং, পৃঃ ২৫১—২৫২।
৪। ঐ পৃঃ ২৫০—২৫১।
৫। ঐ পৃঃ ২৫৩—২৫৪।
৬। এঙ্গেলস্, ডায়ালেক্টিকস্ অফ নেচার, পৃঃ ২০।
৭। ঐ পৃঃ ২১।
৮। ঐ
৯। মার্কস, থিয়োরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৯৬।
১০। ঐ পৃঃ ১৫৭।
১১। ঐ পৃঃ ১৫৮।
১২। ঐ পৃঃ ৪০১।
১৩। ঐ পৃঃ ২৮৫।
১৪। ঐ, হেনরিয়াড—ভলটেয়ার লিখিত কাব্য।
১৫। মার্কস, এ ক্রিটিক টু দি কনট্রিবিউশন অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, পৃঃ ৩১১।
১৬। মার্কস, ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট, পৃঃ ১৩৬—১৩৭।
১৭। শেকসপীয়র, টাইমন অফ এথেনস্।
১৮। ঐ
১৯। মার্কস, ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানুস্ক্রিপ্ট, পৃঃ ১৪১।
২০। মার্কস, থিয়োরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪০১।

পঞ্চম অধ্যায়

বিচ্ছিন্নতা ও শিল্প-কলা

অন্তর্নিহিত অমানবিকতা

শিল্পীর শিল্পকৃতিকে মার্কস রেশম কীটের রেশম সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এর সমার্থ এই, যে প্রেরণাসঞ্জাত হয়ে ধনতান্ত্রিক সমাজে 'পণ্য' উৎপাদন হয় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি সেই প্রেরণাসঞ্জাত নয়। শিল্পকৃতি মানুষের সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণারই ফলশ্রুতি।

পণ্য উৎপাদিত হয় বাজারের জন্য, বিনিময়ের জন্য এবং পরিণতিতে উদ্বৃত্ত-মূল্য সঞ্চয়ের জন্য। পণ্য উৎপাদন অর্থকরী-কর্ম, সৃষ্টির প্রেরণা-সঞ্জাত কোন ক্রিয়াকলাপ নয়। মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটেল' গ্রন্থে শুধুমাত্র পণ্যের ব্যাখ্যাই করেন নি, তিনি পণ্য-পূজা ও তার রহস্যের বিশ্লেষণও করেছেন। যখন কোন বস্তুর ব্যবহারিক-মূল্য সরাসরি সেই বস্তু এবং মানুষের সম্পর্কের মধ্যেই অনুভূত হয় ততক্ষণ সেই বস্তু পণ্যে পরিণত হয় না কিন্তু যখনই সেই বস্তুর ব্যবহারিক মূল্য একমাত্র বিনিময়, অর্থাৎ একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনুভূত হয়, তখনই সেই বস্তু পণ্যে পরিণত হয়।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পসৃষ্টি পণ্য উৎপাদনেরই মত একটি উৎপাদন। এর নিজস্ব কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, এর ব্যবহারিক মূল্য অনুভূত হয় একমাত্র বিনিময়ের মাধ্যমেই।

ধনতান্ত্রিক সমাজের এই মৌল নিয়মের সঙ্গে আরেকটি অমোঘ নিয়মও যুক্ত। সেই নিয়ম মার্কসের ভাষায়, 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিয়মাধীন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় সমাজের প্রতি একজন ব্যক্তির যে অনুরাগ তা হচ্ছে ঠিক সেই ব্যক্তির প্রতি সমাজের যে অনুরাগ তার বিপরীত অনুপাতে—ঠিক যেমন একজন অমিতব্যয়ী ব্যক্তির প্রতি একজন সুদখোরের যে আকর্ষণ তা অমিত-ব্যয়ীর আকর্ষণের সমরূপ নয়।'[১] অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক অনুরাগ বিপরীত অনুপাতে বিদ্যমান।

এখন যেটা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্টির স্বাভাবিক প্রেরণা যেখানে রুদ্ধ, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক আকর্ষণ যেখানে বিপরীত অনুপাতে নির্ধারিত, সেখানে মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি, মানুষের সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির

ইন্দ্রিয়গত রূপ কি নিদারুণভাবেই না ব্যাহত! ধনতান্ত্রিক সমাজে সৃষ্টির এই অন্তর্নিহিত বিরোধ, যে বিরোধ সৃষ্টির আনন্দকে নিরানন্দে পরিণত করছে, মার্কস তার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর বিচ্ছিন্নতার (এলিয়েনেশন) তত্ত্ব দিয়ে।

ধনতান্ত্রিক সমাজের চরম বেদনাদায়ক বৈশিষ্ট্য এটাই যে শ্রমিক যত বেশী সম্পদ সৃষ্টি করে ততই সে দরিদ্রতর হয়। শ্রমিক যত অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করে শ্রমিক তত অধিক সস্তা পণ্যে পরিণত হয়। 'বস্তু জগত যত বেশী মহার্ঘ হয় মানুষের জগতের তত বেশী অবমূল্যায়ন ঘটে।'[২] ধনতান্ত্রিক সমাজের এটা এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী। শ্রম এখানে প্রেরণা-সঞ্জাত নয়, শ্রম এখানে নিতান্তই জীবনধারণের তাগিদে। কারণ শ্রমিক তার সৃষ্ট সম্পদবৃদ্ধির অনুপাতে দরিদ্রতর হয়, বস্তুর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে তার মূল্য হ্রাস পায়। এই সত্য 'এটাই প্রকট করে তোলে, শ্রমিক যে বস্তু উৎপাদন করে—শ্রমিকের সৃষ্ট বস্তু—একটা বিচ্ছিন্ন কিছু, সৃষ্টিকর্তা থেকে স্বতন্ত্র একটা শক্তি হিসাবে শ্রমিকের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। বিষয়ে পরিণত বস্তুর মধ্যে দানা বাঁধা শ্রমই হচ্ছে শ্রমিকের সৃষ্ট বস্তু, এ হচ্ছে শ্রমের বিষয়ীকরণ। শ্রমের বাস্তবে পরিণত হওয়াই হচ্ছে এর বিষয়ীকরণ। ......শ্রমের এই বাস্তবে পরিণত হওয়া শ্রমিকের কাছে বাস্তবের বিনাশ হিসাবেই উপস্থিত হয়; বিষয়ীকরণ উপস্থিত হয়—বিষয়ের বিনাশ এবং বিষয়-দাসত্ব হিসাবে; অধিকার উপস্থিত হয় বিচ্ছিন্নতা হিসাবে, পরস্ব হিসাবে।'[৩]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের বাস্তবায়ন শ্রমিকের নিকট এতটাই বাস্তবের বিনাশ হিসাবে উপস্থিত হয় যে তা শ্রমিককে অনাহারে মৃত্যুর পর্যায়ে ঠেলে নিয়ে যায়। শ্রমিকের শ্রমের বিষয়ীকরণ যে অনুপাতে ঘটে শ্রমিক ঠিক সেই অনুপাতেই বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রমিক যতই বেশী উৎপাদন করে বিষয়ের উপর তার আপন অধিকার ততটাই পরস্ব হয়ে যায় এবং সে ততটাই তার উৎপাদিত বস্তু অর্থাৎ পুঁজির কব্জায় আবদ্ধ হয়ে যায়। আরও বলা যায় শ্রমিক যতই অধিক উৎপাদন করে ততই তার সৃষ্ট বস্তুজগত তার থেকে অধিকতর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ততই তার অন্তর্জগত দরিদ্রতর হয়। তার সৃষ্টি যত বৃদ্ধি পায় সে নিজে তত ক্ষুদ্র হয়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এটা বস্তুতই একটা মর্মান্তিক প্রক্রিয়া। শ্রমিকেরই সৃষ্ট বস্তু শ্রমিকের বহিঃস্থরূপে অবস্থান করে এবং শুধু তাই নয়,

আরো সুষ্ঠুভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে বস্তুতে সে প্রাণসঞ্চার করেছে সেই বস্তুই একটা প্রতিকূল শক্তি হিসাবে, একটা পরদেশী হিসাবে তার সঙ্গে সংঘর্ষশীল হয়।

এই মর্মান্তিকতা আরও বিভিন্নভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। শ্রমিক যত বেশী মূল্য সৃষ্টি করে তত বেশী সে নিজে মূল্যহীন হয়, শ্রমিক তার সৃষ্ট বস্তুকে যত বেশী সুন্দর করে গড়ে তোলে সে নিজে তত বেশী বিকৃত হয়, তার সৃষ্ট বস্তু যত বেশী উন্নত হয় তত বেশী সে পিছিয়ে পড়ে। 'এটা সত্য যে শ্রম ধনীদের জন্য চমৎকার সব জিনিষ সৃষ্টি করে, কিন্তু শ্রমিকের জন্য সৃষ্টি করে বঞ্চনা। শ্রম প্রাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু শ্রমিকের জন্য সৃষ্টি করে জঘন্য কুঁড়েঘর। শ্রম সৌন্দর্য সৃষ্টি করে—কিন্তু শ্রমিকের জন্য সৃষ্টি করে বিকৃতি। ……শ্রম বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করে—কিন্তু শ্রমিকের জন্য সৃষ্টি করে নিবু'দ্ধিতা, স্থূলতা।'[৪]

শ্রমের সৃষ্ট বস্তুই শ্রমের প্রয়োগকারী শ্রমিকের বৈরী হিসাবে উপস্থিত হয়। এ এক সাংঘাতিক বিরোধ—যার ফলাফল মার্কসের উপরোক্ত বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্টীকৃত। তাই শ্রমের সৃষ্ট বস্তুই যখন পরস্ব, তখন সৃষ্টির ক্রিয়াই তো একটা সক্রিয় পরস্বতা। পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের এই বিচ্ছিন্নতার কি প্রতিক্রিয়া ঘটে মার্কস তা অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন:

'শ্রম শ্রমিকের বহিস্থ এ ঘটনার অর্থ এই যে এটা তার সত্তার অধিকারভুক্ত নয়; তাই তার শ্রমে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে না। নিজেকে অস্বীকার করে, সন্তুষ্ট অনুভব করে না, অসুখী অনুভব করে, নিজের দৈহিক ও মানসিক শক্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশ ঘটায় না, তার দেহকে বিবশ করে মনকে বিনষ্ট করে। শ্রমিক তাই নিজেকে তার কাজের বহিস্থ মনে করে, তার কাজকে তার নিজের বহিস্থ মনে করে। যখন সে কাজ করে না তখন সে স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। এবং যখন সে কাজ করে তখন সে স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না। তার শ্রম তাই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, চাপানো, এটা চাপিয়ে দেওয়া শ্রম। এটা তাই প্রয়োজনের পূর্তি নয়; এটা কেবলমাত্র তার বহিস্থ একটা প্রয়োজনকে মেটাবার উপায়।'[৫] মার্কস শ্রমের এই বিচ্ছিন্নতাকে আরো দেখিয়েছেন যে যখনই কোন দৈহিক বা অন্য কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না তখনই শ্রমিক শ্রমকে প্লেগ রোগের মত এড়িয়ে চলে।

শ্রমের বহিস্থ চরিত্রের বাস্তব অর্থ এই যে শ্রমিকের এই শ্রম তার নিজের থাকে না, তা অপরের সম্পদে পরিণত হয়—এটা 'শ্রমিকের আত্মবিনাশ'।

আর শ্রম যখন দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখার একটা উপায় হিসাবেই মাত্র পর্যবসিত হয় তখন 'জীবনও একমাত্র জীবন ধারণের উপায় হিসাবেই উপস্থিত হয়'।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই যন্ত্রণাবিধুর চরিত্র শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পকর্ম তখনই 'উৎপাদনশীল' হয় যখন সেই শিল্প বাজারের নিয়মের অধীনতা স্বীকার করে, চাহিদা ও সরবরাহের অলঙ্ঘ্য নিয়মের নাগপাশ মেনে চলে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় সেই পণ্যের মধ্যে নিহিত সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের পরিমানের নিরিখে। অথচ শিল্পকর্মের মূল্য বিচারে ধনতান্ত্রিক সমাজেও সেই নিরিখ হুবহু প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে শিল্পকর্মের মূল্য বহুলাংশেই নির্ভর করে যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে তাদের রুচি, পছন্দ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির উপর। তা সত্ত্বেও মূল বিচারে শিল্পকর্ম ধনতান্ত্রিক বাজারের নিয়ম মেনেই চলে। আর এর ফল দাঁড়ায় এই যে বাজারের লক্ষ্য নিয়ে সৃষ্টি করতে যেয়ে শিল্পী বাজারের দাবীকে অস্বীকার করতে পারে না এবং তার অনিবার্য পরিণতিতে শিল্পীর সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবাশ্যকভাবে এসে যায় সীমাবদ্ধতা, ক্ষুণ্ণ হয় তার সৃষ্টিধর্মীতা আর ব্যক্তিত্ব।

মার্কস শ্রমের যে বিচ্ছিন্নতার কথা, শ্রমের পরস্ব হয়ে যাবার যে যন্ত্রণার উল্লেখ করেছেন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেও এসে যায় সেই বিচ্ছিন্নতা, আর ফলে বিনষ্ট হয় শিল্পকর্মের স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্মীতা।

শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যই হল স্রষ্টা তার সৃষ্টির মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে অনুভব করে। কিন্তু যে শিল্পসৃষ্টি স্রষ্টার স্বাভাবিক সৃষ্টিধর্মীতার তাগিদে নয়, বহিস্থ কোন চাহিদার তাগিদে—সেই শিল্পের মধ্যে শিল্পী তার ব্যক্তিত্বকে কখনই অনুভব করতে পারে না। নিজের সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার বিচ্ছিন্নতা তখনই পরিপূর্ণ হয়ে যায় যখন শিল্পকর্ম হয়ে যায় বিপরীত মূখী, যখন তা আর রেশম কীটের রেশম সৃষ্টির মত না হয়ে, হয়ে যায় একমাত্র জীবনধারণের তাগিদে।

এটা অনস্বীকার্য যে মানুষের শ্রমের দ্বারা সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহারিক-মূল্য একটা অতি প্রয়োজনীয় শর্ত কারণ যে কোন বস্তুই উৎপাদিত হয় মানুষের কোন না কোন চাহিদা পূরণের জন্য। কিন্তু অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মত সেই একই নিয়ম সমভাবে প্রয়োগ করে যদি শিল্পকর্মের ব্যবহারিক-মূল্যের উপরও অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় তবে শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত গুণের অবক্ষয়ও

হয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী। কারণটা এই যে অন্য যে কোন উৎপাদিত বস্তু যেমন মানুষের পান, ভোজন, পরিধান ইত্যাদি বৈষয়িক চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নিয়ে উৎপন্ন হয়, শিল্পকর্ম ঠিক মানুষের তেমনি কোন বৈষয়িক চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্ট হয় না, তা সৃষ্ট হয় মানুষের আত্মিক ক্ষুধা, মানসিক চাহিদা পূরণের জন্য।

মার্কস এটাই দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্যান্য পণ্য-দ্রব্যের মত শিল্পকর্মও সাধারণ উৎপাদন পদ্ধতির নিয়মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, আর এর ফলে শিল্পের উৎকর্ষতা বিনষ্ট হয়, শিল্প-কলার অধোগতি ঘটে।

বাজারের চাহিদা ও নিয়ম অনুযায়ী শিল্প-কলা সৃষ্টির এই বাধ্যবাধকতা শিল্প-সংস্কৃতির জগতে সৃষ্টি করে একটা অস্বাভাবিকতা—একটা বিকৃতি। স্রষ্টার সৃষ্টিধর্মীতা যেখানে বিনষ্ট, শিল্প যেখানে বৈষয়িক বস্তুর মতই সরবরাহ ও চাহিদার সর্তাধীন সেখানে মহৎ শিল্প সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই—সেখানে শিল্পকর্মের নামে যা সৃষ্টি হবে তা অন্যান্য বৈষয়িক বস্তুর অনুরূপই একটি বস্তু যারই জনপ্রিয় নাম অপ-সংস্কৃতি।

আর শিল্প-নামক এই বৈষয়িক বস্তু বা অপ-সংস্কৃতি মানুষের সৌন্দর্যবোধ, সূক্ষ্মানুভূতি বা কোমল প্রবৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের পরিবর্তে যা সাধন করবে তা হচ্ছে এদের অবক্ষয়, জগতকে মানবিক করণের পরিবর্তে ঘটাবে ক্রম-অমানবিককরণ।

ধনতান্ত্রিক সমাজেও অনেক শিল্পী বাজারের এই দাসত্বকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

অমানবিকতার বহিঃপ্রকাশ

শ্রমের বাস্তবায়ন যখন শ্রমিকের কাছে 'বাস্তবের বিনাশ' হিসাবে উপস্থিত হয় তখন সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার ভাবজগতে নিদারুণ সংকট সৃষ্টি হওয়াই অনিবার্য। এই সংকট মানব সভ্যতার ইতিহাসে সংস্কৃতির অবক্ষয়ের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। মানবজাতির সমগ্র সৃষ্টির সঞ্চিত ভাণ্ডারই সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির অবক্ষয় যখন শুরু হয় তখন তা সংশ্লিষ্ট সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়েরও সূচনা করে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অমানবিকতা সমগ্র ধনতান্ত্রিক জগতকেই উপস্থিত করে একটা বহির্জগত হিসাবে। যে মানুষ শ্রম করে সে মানুষ এই জগতে বাস করেও এই জগতকে সে নিজের হিসাবে পায় না, এ জগত তার কাছ থেকে থাকে বিচ্ছিন্ন। সে যত বেশী সম্পদসৃষ্টি করে ততই সে

বেশী দরিদ্র হয়, এ যেমন অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে সত্য, তেমনি আত্মিক দিক দিয়েও আরেকটি নগ্ন সত্য হচ্ছে—যে যত বেশী সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ততই তার নিজের জীবন থেকে সৌন্দর্য ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সমাজ সম্পর্কে এই বিচ্ছিন্নতা এখানেই শেষ নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি জন্ম দেয় যে রাষ্ট্রের সেই রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ 'আমলাতন্ত্র' বা ইংরাজীতে 'ব্যুরোক্র্যাসি'[৫]। মার্কস লিখেছেন,

"আমলাতন্ত্র হচ্ছে নাগরিক সমাজের 'রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির আতিশয্য'। এটা হচ্ছে একটা যৌথসংস্থা হিসাবে 'রাষ্ট্রীয় চেতনা', 'রাষ্ট্রীয় এষণা', 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা'—এবং এভাবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই একটা বিশেষ আবদ্ধ সমাজ"।[৬]

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'আমলাতন্ত্র' এমন একটা চক্র যার হাত থেকে কারুর নিস্তার নেই। 'রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির আতিশয্যই' স্বয়ং একটা প্রকৃত শক্তিতে পরিণত হয়, পরিণত হয় তার নিজের বৈষয়িক সারমর্মে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের শক্তি সর্বব্যাপী। আমলাতন্ত্রের শক্তির এই সর্বময়তাকে উল্লেখ করেই মার্কস বলেছেন 'আমলাতন্ত্র হচ্ছে ব্যবহারিক মায়াজাল বা রাষ্ট্রের মায়া'।[৭] মধ্যযুগীয় যাজকতন্ত্রের মতই এদের ক্ষমতা। রাষ্ট্রের জেসুইটদের মত ভূমিকাই পালন করে আমলারা। মার্কসের ভাষায় আরও বলা যায়

'প্রকৃত রাষ্ট্রের পাশাপাশি আমলাতন্ত্রও একটা কাল্পনিক রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের আত্মিক শক্তি। প্রত্যেকটি বস্তুরই তাই দ্বৈত অর্থ বিদ্যমান, একটা বাস্তব, অন্যটা আমলাতান্ত্রিক। প্রকৃত অস্তিত্বশীলকেও বিচার করা হয় আমলাতান্ত্রিক মাপকাঠির আলোকে, এর অন্য—জাগতিক, আত্মিক সারমর্ম অনুযায়ী। রাষ্ট্র যা হচ্ছে সমাজের আত্মিক সারমর্ম তা আমলাতন্ত্রের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই বিরাজমান।......আমলাতন্ত্রের নিজের অভ্যন্তরে আত্মিকতা পরিণত হয় স্থুল বস্তুবাদে—যে বস্তুবাদ হচ্ছে একটা অসার আজ্ঞানুবর্তিতা, কর্তৃত্বে বিশ্বাস, কতকগুলি নির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক আচরণ এবং নির্দিষ্ট নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং ঐতিহ্যের যান্ত্রিকতা।'[৮]

ধনতান্ত্রিক সমাজের উপর এই দানবীয় আমলাতন্ত্রের কব্জাকে হিসাবে ধরলে যা দাঁড়ায় তা হল: (ক) শ্রমের বিচ্ছিন্নতা, (খ) ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক অনুরাগের বিপরীত অনুপাত ও (গ) এক সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান আমলাতন্ত্র—এই তিনটি উপাদান ধনতান্ত্রিক সমাজের ব্যক্তির সৃষ্টিশীলতার উপর চেপে বসে আছে এক বিচূর্ণকারী জগদ্দল পাথরের মত।

ব্যক্তিত্বের এই বিচূর্ণতা ধনতান্ত্রিক সমাজের একটা মর্মান্তিক পরিণতি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম বিভাগের একটা প্রগতিশীল দিক থাকলেও ব্যক্তিত্বের

ক্ষেত্রে এর ফলশ্রুতি চূড়ান্ত হানিকর। তার সৃষ্টিশীলতা বিনষ্ট হয়ে ব্যক্তি পরিণত হয় যন্ত্রের নাটবল্টুতে। এরই সঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উপাদান ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিকেই সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির রূপ কি? এটা একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সম্পর্কে মার্কসীয় বিশ্লেষণ অত্যন্ত ইঙ্গিতবহ। মার্কস লিখেছেন,

'সামন্তসমাজ বিশ্লিষ্ট হয়েছিল তার মূল উপাদানে—মানুষে, কিন্তু যে মানুষ প্রকৃতপক্ষে এই ভিত রচনা করেছিল সে হচ্ছে—আত্মবাদী মানুষ।

'এইভাবেই নাগরিক সমাজের সদস্য, এই মানুষ হচ্ছে রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ভিত্তি, পূর্বসর্ত। মানুষের অধিকারের মধ্য দিয়েই এই রাষ্ট্র তাকে স্বীকার করে নেয়।[৯]

মার্কস বলেছেন এই আত্মবাদী মানুষের স্বাধীনতা বা তার স্বাধীনতার স্বীকৃতি রূপ পেয়েছিল তার জীবনের আত্মিক ও বৈষয়িক উপাদানসমূহের স্বচ্ছন্দ গতির মধ্য দিয়েই। যদিও এই মানুষ ধর্ম থেকে মুক্তি পায় নি, সে পেয়েছিল ধর্মের স্বাধীনতা। সে সম্পত্তি থেকে মুক্তি পায় নি, সে পেয়েছিল সম্পত্তি অর্জনের স্বাধীনতা। এর পরই মার্কস বলছেন,

'রাজনৈতিক বিপ্লব নাগরিক জীবনকে তার উপাদানসমূহে বিশ্লিষ্ট করে, কিন্তু উপাদানগুলির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে না। নাগরিক সমাজকে অর্থাৎ চাহিদা, শ্রম, ব্যক্তিস্বার্থ, নাগরিক আইনের জগতকে সে তার অস্তিত্বের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করে,……অবশেষে নাগরিক সমাজের সদস্য একজন মানুষকে প্রকৃত অর্থেই মানুষ বলে ধরা হয় … কারণ তার ইন্দ্রিয়গত, ব্যক্তিগত এবং তাৎক্ষণিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়েই সে মানুষ, কিন্তু রাজনৈতিক মানুষ হচ্ছে কেবলমাত্র একটা নৈর্ব্যক্তিক কৃত্রিম মানুষ, একজন রূপক-রূপী আইনগত ব্যক্তি হিসাবে মানুষ।'[১০]

ধনতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মানুষ তাই হচ্ছে একটা নৈর্ব্যক্তিক, কৃত্রিম ও রূপক-রূপী মানুষ। আর তার আরেকটা রূপ হচ্ছে আইনগত রূপ। রেনাসাঁ যুগে ব্যক্তির মুক্তির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির যে স্বর্ণ যুগের সূচনা হয়েছিল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মবাদী, অহংবাদী ব্যক্তি পরিণত হল কৃত্রিম ও নৈর্ব্যক্তিক মানুষে। ব্যক্তির এ নৈর্ব্যক্তিকতা জগতটাকে করে তুলল বহির্জগত, যে বহির্জগত তার অধিকারের অতীত, যে বহির্জগত তার কাছে বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই জগত ব্যক্তির কাছে বহির্জগত, এই বহির্জগত আবার ব্যক্তির কাছে এক

ব্যুরোক্র্যাটিক জগত, আর এই বহির্জগতে ও ব্যুরোক্র্যাটিক জগতে ব্যক্তি হল নৈর্ব্যক্তিক কৃত্রিম মানুষ। এটাই ধনতান্ত্রিক সমাজের গূঢ় রহস্য, এটাই ধনতান্ত্রিক সমাজের মর্মবেদনা, যে বেদনা সমাজকে করে তুলেছে অবক্ষয়ী। এই ব্যক্তিত্বহননকারী সমাজব্যবস্থায় মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্কও হয়ে দাঁড়ায় আমানবিক। ব্যক্তির বিশিষ্ট গুণ বিলীন হয়ে যায় তার নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে। শ্রমবিভাগ, উদ্বৃত্ত-মূল্য, আমলাতন্ত্রের আতিশয্য ব্যক্তি-মানসকে যেমন পিষ্ট করে তেমনি তার সৃষ্টিশীলতা আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে সৃষ্টি করে অবরোধ। এ জগতটা তার কাছে হারিয়ে যায়।

মানুষের জীবনে 'বাস্তবতার বিনাশ', তার নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া তার আত্মিক জীবনে কি সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন পাওয়া যায়।

জঁ্যা-পল-সাত্রের মত অস্তিত্ববাদীরা তাঁদের দর্শনের মধ্য দিয়ে এই সংকটের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। একজন ব্যক্তি যেন এই জগতে হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হল এই ভাবেই তাঁরা ব্যক্তির সঙ্গে জগতের সম্পর্ককে দেখেছেন। একটা একাকীত্ব, একটা অপর্যাপ্ততা, একটা অক্ষমতাকেই তাঁরা অনুভব করলেন মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে, আর তার ফল হল একটা অনিবার্য হতাশা এবং যন্ত্রণা। এই চিন্তায় মূল সুর যেটা ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেটা হল অস্তিত্বের একটা অর্থহীনতা, একটা অলীকতা। এ হল অস্তিত্ববাদী চিন্তার মূল কথা—যার পরিণতি হতাশায়।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের যুগ যন্ত্রণা, নৈর্ব্যক্তিক মানুষের বেদনা ও পরিণতি অনেক বেশী নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে ফ্রান্‌জ্‌ কাফ্‌কার সাহিত্যে। তাঁর 'দি ট্রায়াল' নামক নাটকটি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের নায়ক যে শুধু 'K' নামে পরিচিত, যার কোন পূর্বপরিচিতি নেই, যে একটা অজানা অভিযোগে অভিযুক্ত হল, আমলাতান্ত্রিক বিচারালয়ের অদৃশ্য বিচারে যে শাস্তি প্রাপ্ত হল এবং তারপর দুই 'ভদ্রলোক' ঘাতকের ছুরিকাঘাতে তার শেষ পরিণতি ঘটল। সমস্ত উপন্যাসটার মূল সুরই হল একটা বিচ্ছিন্নতার সুর। যেখানে জগত মানুষের কাছে বহির্জগত, যেখানে ব্যক্তির কোন পরিচয় নেই, শুধু নামের শেষ অক্ষর 'K' নামের পরিচিতিই তার পক্ষে যথেষ্ট, যেখানে সে জানে না তার কি অপরাধ, যেখানে সে এক সর্বশক্তিমান বিচারালয়ের বিচারের অধীন। মার্কস রাজনৈতিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির যে কৃত্রিমতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও রূপকতার উল্লেখ করেছেন এ যেন সেই নৈর্ব্যক্তিক রূপক মানুষ।

কাফ্‌কার নায়কের সংগ্রাম ছিল একক—যে একক সংগ্রাম এখানে সম্পূর্ণই অর্থহীন।

মার্কস দেখিয়েছেন শ্রমিক যখন শ্রমরত হয় শ্রমের সঙ্গে তার সেই সম্পর্কের সময় তার শ্রমের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। শ্রম তার কাছে তার বহিস্থ একটা কিছু বলে মনে হয়, এই শ্রম তাকে বিবশ করে, অস্বীকার করে এবং তার সত্তার অংশ হিসাবে বিরাজ করে না। শ্রমিক তাই নিজেকে অত্যন্ত অবরুদ্ধ মনে করে কারণ কাজের মধ্য দিয়ে তার দৈহিক ও মানসিক গুণগুলি বিকশিত হয় না। কাফ্‌কার নায়কও তেমনি ছিল একজন বিচ্ছিন্ন বা এলিয়েনেটেড মানুষ যার নিজের সঙ্গে নিজের কোন মানবিক সম্পর্ক ছিল না, যার নিজের কাজও নিজের কাছে মনে হত বহিস্থ।

ধনতান্ত্রিক সমাজে এই বিচ্ছিন্নতা সমস্ত বাস্তব মানুষের মধ্যেই প্রকাশমান —এটা প্রকাশমান তার ব্যক্তিজীবন ও জনজীবনের ফারাকের মধ্যে, তার ব্যক্তিত্ব ও নৈর্ব্যক্তিকতায় বিভেদের মধ্যে। তার ব্যক্তিত্বকে নৈর্ব্যক্তিকতায় বিলীন হওয়ার পথে সে বাধা দেয়, তার বিশেষ বিশেষ মানবিক গুণগুলিকে শূন্যগর্ভে ও আনুষ্ঠানিক সর্বজনীনতায় হারিয়ে যাওয়ার পথে সে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় যখন এই প্রতিরোধের অবসান ঘটে। যখন ব্যক্তি আর নৈর্ব্যক্তিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য সে অনুভব করে না। মানুষের অস্তিত্ব তখন হয়ে পড়ে ব্যক্তিত্বহীন এবং অবাস্তব।

একটা বিচ্ছিন্ন জগতে ব্যক্তির সংগ্রাম অর্থহীন হয়ে পড়ে—যতক্ষণ না সে এই বিচ্ছিন্নতার সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের উপলব্ধি করে এবং সেই সংগ্রাম ঐ সামাজিক অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পরিবর্তনের জন্য মিলিত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যেও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের এই বিচ্ছিন্নতা এবং তার থেকে উদ্ভূত ব্যক্তির নৈর্ব্যক্তিকতা ও যন্ত্রণার প্রকাশ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই অনুভূতি অবশ্যই মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষা সঞ্জাত নয়। এই অনুভূতি নেহাতই সমাজ বিশ্লেষণে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও উষ্ণ মানবিকতা প্রসূত। 'রক্ত করবী' নাটকে রাজার স্বর্ণখনিতে গ্রামের মানুষরা কাজ করে। সেই গ্রামের মানুষদের সকলেরই তো একটা ব্যক্তি পরিচিতি ছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তির মুনাফার জন্য সেই ব্যক্তি যখন কাজ করতে এল তখন সে হারিয়ে গেল নৈর্ব্যক্তিকতায়, তার শ্রমের আনন্দ গেল

শুকিয়ে, সে অনুভব করল তার শ্রমের বিচ্ছিন্নতা। চন্দ্রা শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করছে, কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরবে? তারপর যে কথপোকথন :

'বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দুদিন, দুদিনের পর তিন দিন; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি; এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন সংখ্যা?

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার?

বিশু। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায়; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না' ?[১১]

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মার্কস শ্রমের যে বিচ্ছিন্নতাব ব্যাখ্যা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী' নাটকের এই কয়েকটি প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে সেই বিচ্ছিন্নতা ফুটে উঠেছে নির্মম ভাবে। ব্যক্তি মানুষগুলো সোনার খনিতে এসে কতকগুলি নৈর্বক্তিক এবং কৃত্রিম সংখ্যায় পরিণত; এদের শ্রমে আনন্দ নেই, শুধু মালিকের সম্পদ বৃদ্ধি করেই চলেছে এরা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা হচ্ছে নিঃস্ব, নিস্পিষ্ট। রক্ত করবী নাটকের পরিণতি যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেই সংগ্রাম যদিও কিছুটা অলীকতায় পর্যবসিত, তবুও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই বিচ্ছিন্নতা বোধ, মনুষ্যত্বের অমানবিককরণের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা অবিস্মরণীয়, অনন্য। এখানেই রক্ত করবী নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মার্কস উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রকৃত মানবিক ঐশ্বর্য মানবের ব্যক্তিত্বের সর্বজনীন বিকাশের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষ হিসাবে মানুষের নিজস্ব সত্ত্বা ততই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয় যত বেশী সর্বজনীনতার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং যত অধিক বৈচিত্রের সঙ্গে তার গুণাবলীর প্রস্ফুটন ঘটে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম বিভাগ একটা সীমাবদ্ধ কর্মতৎপরতার মধ্যে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে

ফেলে এবং একটা এক-মাত্রিক চরিত্রের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। তার এই সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্বের সর্বজনীন বিকাশে অসমর্থ হয়ে সে নিজের সত্ত্বাকে খণ্ডিত করে ফেলে।

একজন সচেতন ও সৃষ্টিশীল সত্ত্বারূপে নিজের বিকাশের জন্য মানুষের প্রয়োজন এই সীমাবদ্ধতা ও তার কর্মতৎপরতার এক-মাত্রিকতার উর্দ্ধে ওঠা; মানুষের স্বাধীনতাকে তার ব্যক্তিত্বের সর্বজনীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মার্কস তাই বলেছেন জীবনের মানবিক বিকাশের সার্বিকতার মধ্যেই একটা সমৃদ্ধ মানুষের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রম বিভাগ মানুষের ব্যক্তিত্বের এই বিকাশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রম বিভাগ যেমন ব্যক্তিত্বের এই বিকাশকে রুদ্ধ করে মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে, তেমনি শ্রমের 'বিচ্ছিন্নতা' শ্রমদাতাকে করে তোলে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর। এই দ্বৈত প্রক্রিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজে যে অবক্ষয়ের সূচনা করে তার প্রকটতম ফলশ্রুতি ঘটে সংস্কৃতির অবনমন ও মানবিক মূল্যবোধগুলির অবমূল্যায়নের মধ্য দিয়ে। মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ কর্মগুলি হয়ে পড়ে মূল্যহীন, জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ, ভবিষ্যৎ হয়ে যায় উদ্দেশ্যহীন, সৃষ্টিশীলতা খর্ব হয়ে পর্যবসিত হয় যান্ত্রিকতায়, মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির স্থান গ্রহণ করে পাশবিক প্রবৃত্তি, আর সৌন্দর্যবোধ বিলীন হয়ে যায় কদর্য স্থূলতায়।

১। মার্কস, ইকনমিক এণ্ড ফিলজফিক ম্যানুসক্রিপ্টস্ ১৮৪৪, পৃঃ ৫৭।
২। ঐ পৃঃ ৬৯।
৩। ঐ
৪। ঐ পৃঃ ৭১।
৫। ঐ পৃঃ ৭২।
৬। মার্কস, কনট্রিবিউশন টু দি ক্রিটিক অফ হেগেলস্ ফিলজফী অফ ল, মার্কস-এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫—৪৬।
৭। ঐ পৃঃ ৪৬।
৮। ঐ পৃঃ ৪৭।
৯। মার্কস, অন দি জ্যুয়িশ কোশচেন, মার্কস-এঙ্গেলস কালেক্টেড ওয়ার্কস্, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৬
১০। ঐ পৃঃ ১৬৭।
১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রক্ত করবী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূল্যবোধ ও নৈতিকতা

অর্থনৈতিক ভিতের উপর যে আদর্শগত উপরিসৌধ গড়ে ওঠে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাও তার অঙ্গীভূত। মানবসমাজের সাংস্কৃতিক জীবনকে অপরিসীমভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে বিশেষ সমাজের উপর গড়ে ওঠে নৈতিক মূল্যবোধ। বস্তুতঃ সমাজে সম্পত্তি উদ্ভাবনের ধারাটিকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করলে মানব সমাজের মনোজগতের ইতিহাসটিকেও উদঘাটিত করা যায়।

জীবজগতে একমাত্র মানবজাতির ইতিহাসই সম্পত্তি আহরণের ইতিহাস, যে সম্পত্তি পরবর্তীকালে মূলধনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পিঁপড়ে সমষ্টিগতভাবে তার খাদ্য আহরণ করে এবং তা ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখে। কিন্তু পিঁপড়ের জমানো সেই খাদ্য তাদের নিজেদের খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, ভবিষ্যতে তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু মানবসমাজ সম্পত্তি সৃষ্টি করে উপরোক্ত দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্যই।

অর্থনৈতিক ইতিহাসে মূলধনের পূর্ণাঙ্গ আবির্ভাব ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীতেই। আর তখন থেকেই শুরু হয় সামাজিক ধ্যানধারণার উপর মূলধনের আধিপত্য। ১৭৮৯ সালে 'সাম্য' 'স্বাধীনতা' ও 'মৈত্রী'র ধ্বনি তুলে যে ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল বাস্তবে মূলধনেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রাপ্তির বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষকে সামন্তবাদী নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল, কিন্তু তাকে সঙ্গে সঙ্গে আবার মূলধনী শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ করে দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লব সম্পত্তির যে নবরূপায়ণ ঘটালো এবং ফরাসী বিপ্লব যাকে আদর্শান্বিত করল সে হল বাস্তবে 'ক্যাপিট্যালিস্ট' নামক অগাধ সম্পত্তির অধিকারী একটি দানব—'যার আছে একটি লৌহনির্মিত হৃদয় এবং যে একমাত্র ধাতব আবেগ ছাড়া আর সমস্ত রকম আবেগহীন।'[১]

এই নবউদ্ভাবিত 'ক্যাপিট্যালিস্ট' যে সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলল তাতে সে যেমন হল সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী এবং তার একমাত্র আবেগ ও অনুভূতি হল সম্পত্তি বৃদ্ধির দুর্নিবার তাগিদ তেমনি ঐ 'ক্যাপিট্যালিস্টের' সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হল যে 'প্রলেতারিয়েত'—সেই 'প্রলেতারিয়েত'কে সে করে দিল সম্পূর্ণ নিঃস্ব। প্রলেতারিয়েতের বাংলা অর্থ তাই 'সর্বহারা'।

'ক্যাপিট্যালিস্ট' দানবের উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে যে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার

সৃষ্টি হল সেই সভ্যতা 'সর্বহারাকে বর্বর মানবের জীবনযাত্রা থেকেও নিকৃষ্টতর জীবনযাপনে বাধ্য করল।'[২] পল লাফার্গ বেশ সুন্দরভাবেই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। বর্বর মানুষ অপরের জন্য শ্রম করতে বাধ্য হয় নি। যে বর্বররা ইউরোপ আক্রমণ করেছিল, তাদের পরিধানে জন্তুর চর্ম বা অনুরূপ কোন বস্তুর দ্বারা নির্মিত সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছদ থাকলেও এবং আধুনিককালের একজন শ্রমিক উন্নত যন্ত্রাদির দ্বারা নির্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি পরিধান করলেও—ঐ বর্বররা যে পরিমাণ প্রাণীজ-প্রোটিন গ্রহণ করত আজকের শ্রমিকের দৈহিক গঠন বর্বরদের তুলনায় বহুলপরিমাণে দুর্বলতর হওয়া সত্ত্বেও সে ঐ পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণে আর্থিকভাবে সমর্থ হয় না। অর্থাৎ মানবসভ্যতার বিবর্তনে পুঁজির আবির্ভাবের সঙ্গে যে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে বাস্তব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে তারা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা গঠনের মূলভিত্তি সমাজের এই বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভরশীল।

দাস সমাজে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করা এবং ক্রীতদাসকে এমন কি হত্যা করাও ঐ সমাজের নৈতিক মান অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ছিল। ঐ সমাজের মানবীয় মূল্যবোধ ক্রীতদাস প্রথাকে যথার্থ বলেই মনে করেছিল। কিন্তু ঐ মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ছিল দাস মালিকদের, দাসদের নয়। কারণ নিগৃহীত দাসরা কখনই তাদের ক্রয়—বিক্রয়কে মেনে নিতে পারে নি। তাদের উপর পাশবিক নির্যাতনকে 'মানবিক' বলে মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দাস-প্রথা কেন 'নৈতিক ও মানবিক' ছিল? কারণ দাস মালিকদের স্বার্থ এই দাস প্রথার দ্বারা সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ হত বলেই। আর এই 'নৈতিকতা', 'মানবিকতা' ইত্যাদির মানদণ্ড নির্ধারিত হত সমাজের উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা যাদের হাতে ছিল তাদের দ্বারাই। এই মালিকরাই ছিল শোষক, তারাই মানুষ কেনাবেচা করত; আর তাদের স্বার্থেই নির্ণিত হত সেই সমাজের আদর্শগত মানদণ্ড। সেখানে শোষিতদের বলবার কিছু ছিল না। এইভাবেই প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সমগ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এই দাস-শ্রমের উপর ভিত্তি করেই। ঐ যুগের মহান দার্শনিকরাও তাই দাসপ্রথাকে 'নৈতিক' ও 'ন্যায়সঙ্গত' বলে আখ্যাত করেছেন।

অনুরূপভাবেই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজে ঐ সমাজের উৎপাদনের মালিকানা ও শোষণের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল সেই যুগের মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। তাই একদিকে যেমন ছিল 'কিং ক্যান ডু নো রংগ্' অর্থাৎ 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারে না'—এই অমোঘ নীতিবাক্য—যে

নীতিবাক্য রাজার সমস্ত অত্যাচার ও অন্যায়কে যাথার্থ্যতা ও ন্যায্যতা দেওয়ার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল, অপরদিকে তেমনি উদ্ভাবিত হয়েছিল শোষিত ও নির্যাতিত প্রজাদের জন্য 'রাজভক্তি' 'রাজানুগত্য' ইত্যাদি নীতি ও মূল্যবোধ। রাজার অত্যাচার যেমন অত্যাচার নয়, তা রাজার রাজ্যশাসন মাত্র, তেমনি তার অত্যাচারের বিরোধিতাও অন্যায় এবং তা 'রাজদ্রোহ'। একমাত্র ন্যায়--'রাজভক্তি' ও 'রাজানুগত্য'। প্রজার দোষ-গুণ বিচার্য এই 'রাজভক্তি' ও 'রাজানুগত্যের' নিরিখেই। 'রাজদ্রোহ' তাই অন্যায় ও গর্হিত কার্য এবং তাই কঠোরভাবে দণ্ডনীয়। মধ্যযুগীয় সাহিত্য তাই রাজার প্রশস্তি, আর 'রাজভক্তি' ও 'রাজানুগত্যের' মহিমা প্রচারে ভরপুর। ঐ যুগের সমগ্র সংস্কৃতি এই নীতি ও মূল্যবোধকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল।

অনুরূপভাবে বুর্জোয়া সমাজে অপরের শ্রমার্জিত মূল্য অপহরণ করা, সম্পত্তির লালসা, সুদখোরী ইত্যাদিকে ন্যায় ও নীতিসঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত—বুর্জোয়া যুগেও নারী সমাজের চরম অবমাননা—গণিকাবৃত্তিকেও ন্যায়সঙ্গত না হলেও আবশ্যক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং তাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

বুর্জোয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সুদখোরী ও অপরের অর্জিত ধন আত্মসাৎ করা অত্যন্ত সম্মানজনক জীবনাদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। পল লাফার্গের ভাষায়,

'বুর্জোয়ারা সুদখোরীকে নবজীবন প্রদান করেছে এবং সুদী-ব্যবসাকে সভ্যতা বিকাশের একটা অত্যন্ত লাভজনক ও সম্মানীয় কর্ম বলে মহিমান্বিত করে তুলেছে। অপরের অর্জিত অর্থের ধারক হয়ে সেই অর্থের উপর জীবন-ধারণ করা হচ্ছে বুর্জোয়াদের জীবনাদর্শ।' ৩

সুদী ব্যবসাকে ন্যায়সঙ্গত করা এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদী ব্যবসার প্রচলন করা ছিল ১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের সফল ক্রিয়া-কাণ্ড-সমূহের অন্যতম। ধনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সুদী ব্যবসা আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসার রূপে উন্নত হয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্রে পালন করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আর অপরের শ্রমার্জিত মূল্য আত্মসাৎ করা, সুদী ব্যবসা চালনা করা, শ্রমিককে বর্বরতম জীবনযাপনে বাধ্য করা, গণিকাবৃত্তিকে সুরক্ষিত করা—ইত্যাদি কর্মকাণ্ডকে নৈতিক বলে স্বীকার করে নিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাই বুর্জোয়া সংস্কৃতি।

শ্রেণী-নৈতিকতা

মার্কস ও এঙ্গেলস্ এই কথাই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে নৈতিকতাও সর্বদাই শ্রেণী-নৈতিকতা। এর দুই ধরণের ব্যাখ্যাই হতে পারে যে—শ্রেণী সমাজে সমগ্র শ্রেণীর পক্ষেই গ্রাহ্য কোন সাধারণ নৈতিক মানদণ্ড নেই; অথবা ঐ সাধারণ নৈতিক মানদণ্ড ছাড়াও বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের নৈতিক মানদণ্ডও বিদ্যমান।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ 'শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়' নৈতিক মানদণ্ড স্বীকার করেন নি। কোনটা ন্যায় ও কোনটা অন্যায়, কোনটা ভাল ও কোনটা মন্দ তা সমাজের রূপান্তরের সঙ্গে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করেছে। নৈতিক ক্ষেত্রে কোনটা সত্য এবং কোনটা ভ্রান্তিপূর্ণ তারও কোন অন্তিম সমাধান হয় নি। গাণিতিক প্রতিপাদ্য বিষয়ের মত নৈতিক সত্য প্রতিপাদ্য করা সম্ভব হয় নি। 'অপরের দ্রব্য চুরি করিবে না'—এই নীতি বাক্যটিকেই ধরা যাক। আদিম শ্রেণীহীন সমাজে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না সেখানে চুরি করার প্রশ্নও ছিল না। চুরি করা বিষয়টি মানবের ধারণায়ও স্থান পায় নি। তাই ঐ নীতিবাক্যটি ঐ সময় উদ্ভাবিত হয় নি। এর উদ্ভাবন ঘটে তখনই যখন সৃষ্টি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব থেকেই চুরি করার প্রবৃত্তিটারও উদ্ভব ঘটল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে রক্ষার তাগিদে 'অপরের দ্রব্য চুরি করিবে না' বা 'চুরি করা অন্যায়'—এই নীতিবাক্যেরও উদ্ভাবন হল। এই নীতিবাক্য ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই রক্ষক, তারই স্বার্থবাহী। অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তিমূলক সমাজ উদ্ভাবনের পর থেকে—অর্থাৎ সেই দাস সমাজ থেকে আজ পর্যন্ত এই বুর্জোয়া সমাজ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় শ্রেণী-নৈতিকতার বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও কোন কোন ক্ষেত্রে—যেমন চুরি করার ক্ষেত্রে নৈতিকতাটি সাধারণ নৈতিকতা। কিন্তু আবার যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তিক বুর্জোয়া সমাজের রূপান্তর ঘটবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবিহীন কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন চুরি করার কোন প্রশ্নই আর মানব-জীবনে থাকবে না। তাই তখন 'অপরের দ্রব্য চুরি করিবে না' এই নীতি-বাক্যটিও হয়ে দাঁড়াবে অর্থহীন ও হাস্যোদ্দীপক। এঙ্গেলস্ তাই তাঁর নিজের যুগ পর্যন্ত নৈতিক মানদণ্ডের ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে এই পর্যন্ত তিন প্রকারের নৈতিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম অতীত থেকে বহমান খৃষ্টীয় নৈতিকতা, বর্তমানে আধিপত্য বিস্তারকারী বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং ভবিষ্যৎ সমাজের প্রলেতারীয় নৈতিকতা। এঙ্গেলসের নিজের ভাষায়,

'প্রথমত: অতীতের ধর্মীয় যুগগুলি থেকে প্রাপ্ত খ্রীষ্টীয়-সামন্তযুগীয় নৈতিকতা; এই নৈতিকতা মূলতঃ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট নৈতিকতায় বিভক্ত—আবার এদের মধ্যেও ক্ষুদ্রতর বিভাজনের অভাব নেই…। এরই পাশাপাশি আমরা দেখি আধুনিক বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং তারই পাশে আবার দেখি ভবিষ্যতের প্রলেতারীয় নৈতিকতা। এর অর্থ সর্বাপেক্ষা উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলিতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই তিন প্রকারের নৈতিক তত্ত্বের অস্তিত্ব একই সঙ্গে এবং পাশাপাশি বিরাজ করছে। এর মধ্যে কোনটা সত্য? একেবারে শাশ্বত হিসাবে কোনটাই না। কিন্তু অবশ্যই সেই নৈতিকতাই অধিকতর স্থায়িত্বের অধিকারী যে নৈতিকতা বর্তমানে, বর্তমানকেই উৎসাদনের প্রতিনিধিত্ব করে, করে ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব—এবং তাই হচ্ছে প্রলেতারীয় নৈতিকতা।'[৪]

এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী বর্তমান পৃথিবীতে সামন্ত অভিজাতবর্গ, বুর্জোয়া এবং প্রলেতারিয়েত—সমাজের এই তিন অংশই পৃথক পৃথক নৈতিক আদর্শের অধিকারী। এঙ্গেলস্ এই পৃথক নৈতিক আদর্শগুলিকেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে সচেতনভাবেই হোক অথবা অচেতনভাবেই হোক বিভিন্ন সমাজের মানুষ তাদের দৈনন্দিন সামাজিক অনুশীলন এবং উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতিতে তাদের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তাদের নিজস্ব নৈতিক আদর্শ নির্দ্ধারণ করে নেয়।

এঙ্গেলস্ শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় নৈতিকতার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন এই সামাজিক অনুশীলন ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিপেক্ষিতেই। সামাজিক অনুশীলন কোন স্থাণু প্রক্রিয়া নয়, এটি চলমান প্রক্রিয়া—এবং যেহেতু চলমান তাই পরিবর্তনীয়। অর্থনৈতিক সম্পর্কও স্থিতিশীল নয়—তা পরিবর্তনশীল, তাই অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে নৈতিকতা গঠিত তাও পরিবর্তনীয়।

মানবসমাজের সাংস্কৃতিক মান বিশেষ বিশেষ সমাজের বিশেষ বিশেষ নৈতিকতায় সম্পৃক্ত। তাই সামন্তযুগে, বুর্জোয়াযুগে বা ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজে মানবসমাজের যে সাংস্কৃতিক মান পরিদৃষ্ট হয়েছে বা হবে তা আদৌ একই বা অবিমিশ্র নয়। রোমান এ্যাম্পিথিয়েটারে গ্ল্যাডিয়েটারদের (দাস-যোদ্ধা) পারস্পরিক লড়াইতে বাধ্য ক'রে একজনকে দিয়ে অপরজনকে হত্যা করানোর দৃশ্য মধ্যযুগীয় সমাজের অভিজাতবর্গের নিকট একটি অতি আকর্ষনীয় দ্রষ্টব্য ছিল। অথবা, এ্যাম্পিথিয়েটারে ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদের দিয়ে অসহায় বন্দী বা ক্রীতদাসদের ছিন্নভিন্ন করে খাওয়ানোও ঐ অভিজাতদের

কাছে খুবই উপভোগ্য ও দর্শনীয় ছিল। মানুষের যে মূল্যবোধ এই ধরনের পৈশাচিক ক্রিয়া-কলাপের উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল তা ছিল নিতান্তই মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের মূল্যবোধ, যে মূল্যবোধ বুর্জোয়া সমাজে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কিন্তু শিল্পবিপ্লবের যুগে, প্রথম বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা চালু হওয়ার কালে যে পদ্ধতিতে শ্রমিক শোষণ করা হত, পাঁচ বৎসরের শিশু শ্রমিকদেরও বেত্রাঘাত করে যে ভাবে শ্রমে বাধ্য করা হত, বা গর্ভবতী নারী শ্রমিকদেরও সামান্য মজুরীর বিনিময়ে যে ভাবে যন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত এবং তাও দৈনিক বারো, চৌদ্দ বা ষোল ঘণ্টার জন্য—তা এ্যাম্পি-থিয়েটারে বন্দী বা দাসদের নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে আপাতদৃষ্টিতে নমনীয় মনে হলেও সামগ্রিক বিচারে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটাও ছিল সাংঘাতিক ধরণের অমানবিক। একজন, দুইজনকে নয়—গোটা নারী, শিশুসমেত গোটা শ্রমিকশ্রেণীকেহ বুর্জোয়ারা অমানুষিকভাবে নিস্পেষিত করে ছিল। এই পদ্ধতির সাহায্যেই ভারতের প্রথম শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অমানুষিকতারই আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। আসাম ও বাংলার চা বাগানের কুলিদের উপর বীভৎস নির্যাতনের কাহিনী তো সর্বজন বিদিত। কিন্তু যে পুঁজিপতিরা এই নির্যাতন চালিয়েছিল—তারা ইউরোপীয়ই হোক বা ভারতীয়ই হোক—তাদের জীবনাদর্শে এই অমানুষিকতা অনুমোদনীয় ছিল। তাদের নৈতিক মান বা মূল্যবোধ অনুযায়ী এই অমানুষিকতাই পুঁজির স্বার্থে স্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড বলে স্বীকৃত হয়েছিল।

বর্তমান ভারতেও গ্রামাঞ্চলে যে হরিজন নিগ্রহ চলে, হরিজন বালককে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা, গর্ভবতী হরিজন যুবতীকে বেত্রাঘাত করা, বা গণহত্যা সংঘটিত করা—ইত্যাদি হরেক রকমের যে রোমহর্ষক ঘটনা দৈনন্দিন ঘটে চলেছে ভারতের গ্রামাঞ্চলে, তা গ্রামের আধা-সামন্ত সমাজের প্রভিভূদের নৈতিক আদর্শে অনুমোদনীয় বলেই তা ঘটে। এই বীভৎস ক্রিয়াকলাপগুলি যে মূল্যবোধসমন্বিত তা হ'ল সামন্তযুগীয় মূল্যবোধ—যে মূল্যবোধ ভারতীয় সমাজের একাংশে এখনও বিরাজমান। ভারতের আধা-সামন্ত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন এই মূল্যবোধ ও নৈতিকতাতেই বিধৃত।

কাজেই নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এই পরিবর্তনের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও ঐতিহাসিক ধারা বিদ্যমান। বিভিন্ন সমাজের নীতিবোধের পার্থক্য সত্বেও একটা সাধারণ ঐতিহাসিক ধারার সন্ধান মেলে। এঙ্গেলস্ তাই মন্তব্য করেছেন,

"কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত তিন ধরণের নৈতিকতার মধ্যেও অনেক সাধারণ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান··· । এই তিনটি নৈতিক তত্ত্ব একই ঐতিহাসিক বিকাশের তিনটি স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাই এদের প্রতিটিরই রয়েছে একই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, এবং একমাত্র সেই কারণেই এবং আবশ্যিকভাবেই এদের মধ্যে অনেক সাধারণত্ব বর্তমান। অনুরূপ বা প্রায় অনুরূপ অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরসমূহে নৈতিক তত্ত্বসমূহ আবশ্যিকভাবেই মোটামুটি একই মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। যে মুহূর্তে থেকে স্থাবর সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হল, সেই মুহূর্তে থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক সমস্ত সমাজেই 'চুরি করিবে না',—এই নীতিবাক্য বহমান থেকেছে।"[৫]

এঙ্গেলস্ সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রতিবাদ করেছেন যে উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যদি ধরে নেওয়া হয় যে নীতিশাস্ত্র হচ্ছে শাশ্বত ও চিরায়ত তা হবে নিতান্তই ভ্রান্ত। নৈতিকতা ঐতিহাসিক বা জাতিগত পার্থক্যের উর্দ্ধে কখনই নয়। তাই এঙ্গেলস্ অত্যন্ত তীব্রতার সঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

'বিপরীতভাবে আমরা মনে করি যে সমস্ত নৈতিক তত্ত্বই শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এবং যেহেতু সমাজ এ পর্যন্ত শ্রেণী সংঘর্ষের দিকেই অগ্রসর হয়েছে তাই সমস্ত নৈতিকতাই শ্রেণী নৈতিকতার রূপ গ্রহণ করেছে। এই নৈতিকতা হয় শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও আধিপত্যের যাথার্থ্যতা প্রদান করেছে, নচেৎ শোষিত শ্রেণী শক্তিশালী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণীর ঘৃণা এবং শোষিত শ্রেণীর স্বার্থকেই এই নৈতিকতা প্রতিবিম্বিত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত নৈতিকতারও যে সামগ্রিকভাবে একটা প্রগতি ঘটছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা এখনও শ্রেণী-নৈতিকতাকে অতিক্রম করতে পারি নি।'[৬]

মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ড তো এই শ্রেণী-নৈতিকতার উপরই গড়ে উঠেছে। ভারতের ক্ষেত্রেই যদি বিষয়টাকে কিছুটা বিচার করা যায় তবে এই শ্রেণী-নৈতিকতার চিত্রটি বেশ সুস্পষ্ট হয়েই ওঠে। প্রথমে নারীর প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রেই বিষয়টাকে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের হিন্দু শাস্ত্রে সহমরণের প্রশস্তি করা হয়েছে। ভারতীয় রক্ষণশীলতার সর্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল মনুসংহিতা। এমন কি পরবর্তী পরাশর সংহিতাতে বিধবা বিবাহের স্বীকৃতি থাকলেও বলা হয়েছে যে, যে নারী সহমরণে যাবে তার স্বর্গবাস হবে মনুষ্যদেহে যত লোম আছে ততকাল—সাড়ে তিন কোটি

বৎসর। এইভাবে সেই যুগে এই বীভৎস নারকীয় প্রথাকেই নৈতিক বলে প্রচার করা হল এবং সতীদাহের বিরুদ্ধতাই অনৈতিক বলে ঘোষিত হল। এই নৈতিকতা মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভাবান্বিত সমাজের নৈতিকতা—যে নৈতিকতা নারীর উপর পুরুষের নির্মম একাধিপত্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকের বুর্জোয়া সমাজে যখন সেই একাধিপত্য শিথিল হতে শুরু করেছে এবং পরিপূর্ণ না হলেও বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সম্পর্কে নারীদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য ও কর্মক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে, তখন এই সতীদাহকে বিবেচনা করতে হয় একটা বীভৎস অনৈতিক কাণ্ড হিসাবেই। বর্তমান বুর্জোয়া সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এই প্রথা অনুমোদন করতে পারে না। তাই দেখা গেল ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রথার বিরুদ্ধে যখন রামমোহন রুখে দাঁড়ালেন ধনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী ইংরেজ শাসকরাও আইন প্রয়োগ করে তখন এই প্রথা নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু গর্ভবতী নারীদের দিয়ে কারখানায় ষোল ঘণ্টা একনাগাড়ে পরিশ্রম করানো ছিল ইংরেজ ও ভারতীয় বুর্জোয়া স্বার্থের পরিপোষক, তাই কারখানায় নারী শ্রমিকদের উপর ঐ অমানুষিক নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজ বা ভারতীয় পুঁজিপতির বিবেক বিদ্রোহ করে নি, উপরন্তু তাকে সুরক্ষা করেছে।

প্রচলিত নৈতিকতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টি

ভারতীয় সমাজে পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল, কিন্তু নারীর সেই অধিকার ছিল না। বিধবা বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল। মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রভাবান্বিত ও পুরুষ শাসিত সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের ক্ষেত্রে একাধিক নারীর সম্ভোগ নৈতিক ও আইনানুগ ছিল, কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিবাহ সম্পর্কে মনুসংহিতার যে নির্দেশ তা মূলতঃ ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নির্ধারিত হয়েছে। মনু পুত্রপ্রকরণে ঔরসপুত্র, ক্ষেত্রজপুত্র, দত্তকপুত্র প্রভৃতির যে ভাগ ও তাদের মর্যাদার যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন তাও পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। ঐ সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্কে নারী সম্পত্তিহীন, এবং স্বভাবতই নানাভাবে ব্যাহত, উৎপীড়িত, পুত্রোৎপাদক জীব এবং সংসারের ভারবাহী দাসী।

ব্যক্তিগত সম্পত্তিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার রক্ষক দার্শনিকরা যে শাস্ত্রীয়

বিধান প্রয়োগ করে গেলেন তাই হয়ে দাঁড়ালো সেই সমাজের নৈতিকতা ও মূল্য-বোধ। ইংরেজী শিক্ষায় অর্থাৎ আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের চিন্তাধারায় সম্পৃক্ত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন ভারতীয় বর্ণহিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তখন হিন্দুধর্মের প্রাচীনপন্থী রক্ষকরা এই সংগ্রামকে অনৈতিক আখ্যা দিয়েছিল। কারণ সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক জীবন বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিল—যদিও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধতা হিন্দুশাস্ত্রে সম্পত্তি রক্ষার তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই চরম রক্ষণশীল নৈতিকতা—যে নৈতিকতা বস্তুতঃ মানবতা বিরোধী তা কিন্তু শুধু বিদ্যাসাগরের আমলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু পণ্ডিতেরাই প্রচার করে নি, তা ঐ একই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্য স্রস্টার দৃষ্টিভঙ্গীকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং বঙ্কিম-সৃষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি কোন কোন ক্ষেত্রে এই মানবতা বিরোধী নৈতিকতাকেই পুষ্ট করেছে। শ্রেণী-নৈতিকতা সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকেও কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে, কোন দেশের সেই সময়কার সাহিত্যই তার সর্বাপেক্ষা জোরালো প্রমাণ।

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে নীতি ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ভারতের সম্পত্তিভিত্তিক রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজেরই নৈতিকতা। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে ভ্রমর যখন তার স্বামী গোবিন্দলালকে বলে, 'আমি তোমার স্ত্রী, শিষ্যা, আশ্রিতা, প্রতিপালিতা—তোমার দাসানুদাসী—তোমার কথার ভিখারী'—তখন মনুসংহিতায় নির্দেশিত নারীর অধঃপতিত সামাজিক অবস্থানকেই মহিমান্বিত করা হয়।[৭] কিন্তু এটা কেবলমাত্র একদিক। অপরদিকে দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালকে দিয়ে তার প্রেমাস্পদা রোহিনীকে হত্যা করালেন। কেন? রোহিনী বাল-বিধবা। সে গোবিন্দলালের প্রেমে পড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ভাষায়, 'রোহিনীর যৌবন পরিপূর্ণ, রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। দোষ, সে কাল পেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত।'[৮] তার গুণও অনেক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গুণাবলীর বর্ণনাও দিয়েছেন। কিন্তু এই পরিপূর্ণ-যৌবনা বাল-বিধবা রোহিনী ভালবেসেছিল। এটা অনৈতিক—তাই সে পাপিষ্ঠা। গোবিন্দলালের গুলিতে তার মৃত্যু হল। নৈতিকতার বিচারে বিবাহিত গোবিন্দলাল কিন্তু দোষী নয়—তাই তার মৃত্যু সাহিত্যসম্রাটের

লেখনীতে আসে নি—এসেছে রোহিনীর মৃত্যু। কিন্তু রোহিনী কি মরতে চেয়েছিল? চায় নি, তাই অন্তিম মূহুর্তে তার আকুতি, 'মারিওনা! মারিওনা! আমার নবীন বয়স, নূতন সুখ।'[৯] কিন্তু হিন্দু নীতিশাস্ত্রে নবীনা রোহিনীর সুখভোগের অধিকার নেই—কারণ সে বাল-বিধবা। সাহিত্যসম্রাটের সাহিত্য ভারতীয় হিন্দুসমাজের বর্ণহিন্দুদের এই নৈতিকতার প্রভাবেই আচ্ছন্ন। এই নৈতিকতার সঙ্গে অবশ্য ভারতীয় সমাজের অধিকাংশের কোন সংযোগ নেই। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যেও ছিল না এই নৈতিকতা, নেই ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যেও। কিন্তু বর্ণহিন্দুদের রচিত সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে রইল এই নৈতিকতারই প্রাধান্য—যে নৈতিকতা শোষণভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তিক সমাজের শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষার স্বার্থে সৃষ্ট।

সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্নও এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। নর-নারীর প্রেম-ভালবাসাকে বাদ দিয়ে সুস্থ সবল জীবন-মুখী জগত গড়ে উঠতে পারে না। প্রশ্নটা সতীত্ব ও একনিষ্ঠ প্রেমের পারস্পরিক সম্পর্ক। হিন্দু নীতিশাস্ত্রে নারীর সতীত্বের মহিমা করা হয়েছে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেমের? এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তিই সর্বাপেক্ষা মর্মগ্রাহী। শরৎচন্দ্রের ভাষায়,

'আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় কৃষ্ণকান্তের উইলের রোহিনীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাশ চালান গেল। অর্থাৎ হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী কিছু আর রইল না। ভালই হল। হিন্দু সমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন, নর-নারীর হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও যেন মনে হয়, দুঃখে সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রুপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয় তাঁর কবিচিত্ত যেন তাঁরই সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে মরেছে।'[১০]

কবির কবিচিত্ত যদি তাঁরই 'সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা করে' তবে সাহিত্য-সাংস্কৃতির পরিণতি কি হয়? পুনরায় শরৎ-চন্দ্রের ভাষায়,

'গোবিন্দলালকে রোহিনী অকৃত্রিম এবং অকপটেই ভালবেসেছিল'—সমস্ত

হৃদয়-প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল, এবং এ প্রেমের প্রতিদান যে সে পায় নি তাও নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়। সে পাপিষ্ঠা, তাই পাপিষ্ঠাদের জন্য নির্দিষ্ট নীতির আইনে বিশ্বাসঘাতিনী তার হওয়া চাই এবং হলও সে। তার পরের ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মিনিট পাঁচেকের দেখায় নিশাকরের প্রতি আশক্তি এবং পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু। মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করি নে, কিন্তু করি তার অকারণ, অহেতুক জবরদস্তির মৃত্যুতে। হৃতভাগিনীর অস্বাভাবিক মরণে পাঠক-পাঠিকার সুশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমাজের বিধি ও নীতির Convention সমস্তই বেঁচে গেল সন্দেহ নেই, কিন্তু ম'ল সে, আর তার সঙ্গে সত্য, সুন্দর art। উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ-রাঙানিতে তার মরা চলে না।'[১১]

শুধু কবিচিত্তের আত্মহত্যাই নয়, যে নৈতিকতার সৃষ্টি শোষণভিত্তিক সমাজের সুরক্ষার স্বার্থে সেই নৈতিকতার যূপকাষ্ঠে মৃত্যু ঘটল সুন্দর আর্টেরও। দেশে দেশে সাহিত্য সংস্কৃতিকে শ্রেণী-নৈতিকতা এভাবেই প্রভাবান্বিত করেছে, কলুষিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই নৈতিকতা সামাজিক জীবনেও জন্ম দিয়েছে অমানবিকতার। জীবনের সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতির স্থান গ্রহণ করেছে কতকগুলি অন্তসারশূন্য শক্ত খোলস।

এই নৈতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই সৌন্দর্য সৃষ্টির সংগ্রাম। যে সংস্কার ও ভাব সাংস্কৃতিক জীবনকে কলুষিত করে, বিনাশ সাধন করে মানুষের সূক্ষ্ম আবেগ ও অনুভূতিগুলির, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী সংগ্রাম। শত বৎসর পূর্বে রামমোহন—ঈশ্বরচন্দ্র অকুতোভয়ে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর প্রবল অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও, নির্যাতিতা নারী সমাজের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ থাকা সত্ত্বেও নারী মুক্তির ক্ষেত্রে তিনি রামমোহন—ঈশ্বরচন্দ্রের সফল উত্তর সূরী হয়েও হতে পারেন নি। তিনি বলছেন,

'সংস্কার ও ভাবের বিরুদ্ধে সৌন্দর্যসৃষ্টি করা যায় না, তাই নিন্দা ও কটূবাক্যের সূত্রপাতও হয়েছে এইখানে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। বিধবা-বিবাহ মন্দ, হিন্দুর ইহা মজ্জাগত সংস্কার। গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে বিধবা নায়িকার পুনর্বিবাহ দিয়ে কোন সাহিত্যিকেরই সাধ্য নাই, নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার। পড়বামাত্রই মন তাঁর তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে উঠবে। গ্রন্থের অন্যান্য সমস্ত গুণই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে।'[১২]

সংস্কার ও ভাবের সমালোচনা শরৎচন্দ্র করেছেন তাঁর শৈল্পিক রীতিতে। তার কলুষকেও তিনি সুস্পষ্ট করেছেন, মানুষের মর্মেও তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহ করতে পারেন নি—ভাঙচুর করতে পারেন নি। তাই তাঁর উপরোক্ত দোদুল্যমান বিশ্লেষণ এবং তাই তিনি 'পল্লীসমাজে' বিধবা রমা ও রমেশের সূক্ষ্ম ও গভীর প্রেমানুভূতি অপরূপ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করলেও রমা ও রমেশের বিবাহ দিতে পারেন নি। তাঁর ধারণা এতে হয়ত নিষ্ঠাবান হিন্দুর মনে তাঁর গ্রন্থ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারবে না।

কিন্তু রক্ষণশীল নৈতিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়। হেনরিক ইবসেন বিদ্রোহ করেছিলেন এবং সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টিও করেছিলেন।

বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয় ঘটেছিল মুক্তির আশ্বাস দিয়েই, কিন্তু বুর্জোয়া উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের স্বার্থেই নারী সমাজের ক্ষেত্রে সেই মুক্তি অপরিপূর্ণই থেকে গেছে। স্বামীর আশ্রিতা, অর্থনৈতিক অধিকার বিহীনা, খেলার পুতুল 'এ ডলস্ হাউস'-এর নায়িকা নোরা হল বিদ্রোহিনী—বিদ্রোহ প্রচলিত স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিরুদ্ধে, স্ত্রীর স্বাধীনতাহীনতা ও মর্যাদা-হীনতার বিরুদ্ধে। নোরা এবং তার স্বামী হেলমার-এর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নোরার মনের যে বিদ্রোহ ফুটে উঠেছে তা প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ। নিম্নে উদ্ধৃত কথোপকথনটি এই বিদ্রোহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত :

'Helmer : Your duty towards your husband and your children—I surely don't have to tell you that !

Nora : I've another duty just as sacred.

Helmer : Nonsense ! What duty do you mean ?

Nora : My duty towards myself.

Helmer : Remember—before all else you are a wife and mother.

Nora : I don't believe that any more. I believe that before all else I am a human being, just as you are—or at least that I should try and become one. I know that most people would agree with you, Torvald—and that's what they say in books. But I can no longer be satisfied with what most people say or what they write in books, I must think things out for myself—get clear about them.'[১৩]

'I don't believe that any more'—একজন নারীর কণ্ঠে কি অসাধারণ কথা।

তারপর যে স্বামীর সঙ্গে কোন প্রেমের সম্পর্ক নেই, সমানাধিকারের সম্পর্ক নেই—শুধু ছিল সন্তান উৎপাদনের সম্পর্ক আর ছিল স্বামীর খেলার পুতুলের সম্পর্ক, বিদ্রোহিনী নোরা শেষ পর্যন্ত সেই স্বামীর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গেল।

নোরার এই বিদ্রোহ বিশেষ করে নাটকের এই শেষ পরিণতি তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজে নিদারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই এই বিদ্রোহ সহ্য করতে পারে নি। অনেকে অবার নাটকের শেষ পরিণতিকে পাল্টে দেবার দাবি জানিয়েছিল।

কিন্তু প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ কি ইবসেনের সাহিত্যের সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছে? এই সাহিত্য কি আর্ট হয় নি? সারা প্রগতিশীল জগত ইবসেনের নায়িকার এই বিদ্রোহকে স্বাগত জানিয়েছে। ইবসেনের নাটক উচ্চ শিল্পগুণসম্পন্ন বলে স্বীকৃত হয়েছে। প্রচলিত নীতি-বোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভবিষ্যৎ সমাজের নীতিবোধকে স্বাগত জানিয়ে সার্থক আর্ট সৃষ্টি করা সম্ভব, তা প্রমাণিত হয়েছে।

নারীর এই অসহায়তা ও স্বাধিকারহীনতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে বিদ্রোহের সন্ধান মেলে। 'স্ত্রীর পত্র' রচনায় রবীন্দ্রনাথের এই বিদ্রোহ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। বিন্দুকে নিয়ে যে অমানুষিক ছেলেখেলা করা হল এবং বিন্দুর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে একটি অসহায় নারীর যে শেষ পরিণতি ঘটল, রবীন্দ্রনাথের নায়িকা মৃণাল তা সহ্য করতে পারে নি। মৃণালও বিদ্রোহ করেছিল, স্বামীর সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। প্রচলিত নীতি ও ধর্মবোধের বিরুদ্ধে মৃণালের বিদ্রোহ অমর হয়ে আছে স্বামীর নিকট লিখিত তার চিঠির কয়েকটি লাইনে। মৃণাল তার স্বামীকে লিখছে,

'কুষ্ঠরোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্যার বাড়িতে নিজে পৌঁছে দিয়েছে, সতী-সাধ্বীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল। জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতার এই গল্পটা প্রচার করে আসতে তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যন্ত একটুও সংকোচ হয় নি, সেই জন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর ব্যবহারে তোমরা রাগ করতে পেরেছ, তোমাদের মাথা হেট হয় নি। বিন্দুর জন্য আমার বুক ফেটে গেল, কিন্তু তোমাদের জন্য আমার লজ্জার সীমা ছিল না। আমি তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তার উপর তোমাদের ঘরে

পড়েছি, ভগবান কোন ফাঁক দিয়ে আমার মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন। তোমাদের এই সব ধর্মের কথা আমি যে কিছুতেই সইতে পারলুম না।'[১৪]

মৃণালের এই অভিযোগ পত্র তৎকালীন ভারতীয় সমাজের প্রচলিত নীতি বোধের বিরুদ্ধেই। সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহের অবদান সামান্য নয়। শরৎচন্দ্র নিজেও তাঁর সাহিত্যে বিদ্রোহিনী নারীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন অপূর্ব সৌন্দর্যসুষমায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অভয়ার চরিত্র কি প্রচলিত নীতিবোধের বিরুদ্ধে খুব সামান্য ধরণের বিদ্রোহ? আর সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এই বিদ্রোহ কি কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে?

মানবীয় নৈতিকতা

শ্রেণী-নৈতিকতা তাই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছে এবং এই নৈতিকতা সেই শ্রেণীশাসিত সমাজজীবনের সাংস্কৃতিক মানকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। সেই সমাজের শিল্প-সাহিত্য তথা সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐ নৈতিকতার দ্বারা।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ নৈতিকতারও পরিবর্তন ঘটে। নতুন নৈতিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয়। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা সেই নতুন নৈতিকতাকে খুঁজে বার করতে পারেন এবং সাহসের সঙ্গে তাকে তাঁর শিল্পে তুলে ধরতে পারেন, তাঁদের শিল্পই হয় যুগোত্তীর্ণ শিল্প—নতুন যুগকে তাঁরাই তাঁদের শিল্পকর্মের মধ্যে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিধৃত করে তুলতে পারেন।

মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজ অতিক্রম করে বুর্জোয়া সমাজের অভ্যুদয়ে বুর্জোয়া নৈতিকতার ভিত্তিভূমি রচিত হল। বুর্জোয়া নৈতিকতা বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষাতেই প্রযুক্ত হল। এই নৈতিকতা বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় অস্তিত্বশীল প্রতিটি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে তা নয়। বরং বিপরীতভাবে পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ এই নৈতিকতা যেমন রক্ষা করে, তেমনি এই নৈতিকতা সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধিতা করে। এই নৈতিকতা সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকারের পবিত্রতা দাবী করে। অপরদিকে সম্পত্তির এই ব্যক্তিগত অধিকার সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে। বুর্জোয়া আইনের বিধান বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করে, অপরদিকে এই আইন বিরুদ্ধতা করে সর্বহারা শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের। বুর্জোয়া বিপ্লব এই বুর্জোয়া নৈতিকতার জন্ম দিয়েছে। তাই প্রশ্ন প্রলেতারীয় বিপ্লব কোন নৈতিকতার জন্ম দেবে

এঙ্গেলস্ বলেছেন 'নৈতিকতার প্রগতি'র কথা। কিন্তু মানবেতিহাসে এ যাবৎ যে কয় প্রকারের নৈতিকতা পরিদৃশ্যমান হয়েছে তাতো সবই শ্রেণী নৈতিকতা। কিন্তু ভবিষ্যৎ সমাজের নৈতিকতার রূপ কি হবে? এঙ্গেলস্ উত্তর দিচ্ছেন সেই নৈতিকতা হবে শ্রেণী-নৈতিকতা নয়—প্রকৃত মানবীয় নৈতিকতা। কিন্তু সেই নৈতিকতা তখনই সৃষ্টি হতে পারে যখন সমাজে আর শ্রেণীবিরোধ থাকে না, অর্থাৎ সমাজ শ্রেণীহীন হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়,

'প্রকৃত মানবীয় নৈতিকতা, যা শ্রেণীসংঘর্ষ বা সেই সংঘর্ষের স্মৃতির উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত তা সমাজবিকাশের সেই স্তরেই সম্ভব হয় যে স্তর কেবলমাত্র শ্রেণী সংঘর্ষের উর্দ্ধেই ওঠে নি, বাস্তব জীবনে তাকে এমন কি বিস্মৃতও হয়েছে।'[১৫]

এঙ্গলসের এই উক্তি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজবিকাশের এক অতি উচ্চস্তরেই এই মানবীয় নৈতিকতার অস্তিত্ব সম্ভব। সেই সমাজ ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লব কোন নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে? এঙ্গেলস্ বুর্জোয়া নৈতিকতার সঙ্গে প্রলেতারীয় নৈতিকতারও উল্লেখ করেছেন। লেনিন এঙ্গেলসের বক্তব্যকে আরও সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। লেনিন বলেছেন,

'শ্রেণী ও মানব বহির্ভূত যে কোন নৈতিকতাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। আমরা বলি এটা একটা বঞ্চনা, ধাপ্পা এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থে শ্রমিক-কৃষককে ভোঁতা করে দেওয়ার কৌশল।

'আমরা বলি আমাদের নৈতিকতা সম্পূর্ণতই সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থের অধীন। আমাদের নৈতিকতার উৎস সর্বহারার শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থ।'[১৬]

লেনিন বলছেন যে পুরাতন সমাজ বিরাজ করছে শোষণ ও নির্যাতনের ভিত্তিতে, তাকে ধ্বংস করাই শ্রমিকশ্রেণীর আশু দায়িত্ব। যে নৈতিকতা পুরাতন সমাজকে ধ্বংস এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে তাই হবে সর্বহারা শ্রেণীর নৈতিকতা। লেনিন আবার বলেছেন, কমিউনিস্ট নৈতিকতা হবে সেই নৈতিকা যা,

'পুরাতন সমাজকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং যে সর্বহারা শ্রেণী নতুন কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলছে তার চারপাশে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করতে সহায়তা করে।

'কমিউনিস্ট নৈতিকতা হচ্ছে তাই যা সমস্ত শোষণ ও যে কোন ধরণের

ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ও সংগ্রামে পরিচালিত করে।'[১৭]

লেনিন একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় জমি সাধারণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হল। 'কিন্তু ধরে নেই যে যদি আমি ঐ সাধারণ সম্পত্তির এক অংশ নিয়ে তার উপর আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্বিগুণ শস্য উৎপাদন করি এবং বাড়তি শস্যের উপর কিছু মুনাফা অর্জন করি তা হলে ? তা হলেও কি আমি একজন কমিউনিস্টের মত আচরণ করব ? না, আমি তখন একজন শোষক ও একজন সম্পত্তিবানের মত আচরণ করব ?'[১৮]

লেনিন কমিউনিস্ট নৈতিকতার আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। এই নৈতিকতার উপরই গড়ে উঠবে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিকল্প প্রলেতারীয় সংস্কৃতি। আর এই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠবে মানবসমাজের বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়া সঠিকভাবে উপলব্ধি, শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা এবং প্রলেতারীয় বিপ্লব সফল করার মধ্য দিয়েই। সুগভীর অধ্যয়ন এবং সক্রিয় সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়।

লেনিন তাই স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছেন,

'উদাহরণ স্বরূপ, যখন আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতির কথা বলি তখন আমাদের এই কথাগুলিকে বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। এই সমস্যাকে সমাধান করতে আমরা সক্ষম হব না যদি না আমরা সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করি যে মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্যে দিয়ে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে কেবল মাত্র তাকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা এবং পরিবর্তন করার মধ্য দিয়েই আমরা প্রলেতারীয় সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারব। এটা হালকা হাওয়াকে জমাট বাঁধিয়ে করা যাবে না, যারা নিজেদের প্রলেতারীয় সংস্কৃতিতে অভিজ্ঞ মনে করে এটা তাদের আবিস্কারও নয়। এগুলো সব বাজে কথা। মানব জাতি ধনতান্ত্রিক, সামন্ততান্ত্রিক এবং আমলাতান্ত্রিক সমাজের জোয়ালের মধ্যে থেকে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি তারই সুসঙ্গত পরিণতি। যেমন মার্কস কর্তৃক নবরূপায়িত রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আমাদের দেখিয়েছে যে মানব সমাজ কোথায় পৌঁছাবে, যেমন আমাদের দেখিয়েছে শ্রেণী সংগ্রামের পথ, দেখিয়েছে প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূচনা, তেমনি ভাবে এই সমস্ত পথই প্রলেতারীয় সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে চলছে এবং এগিয়ে চলবে।'[১৯]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নৈতিকতা যে সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে তাতে বিধৃত হয়ে আছে সামন্ততান্ত্রিক সমাজেরই নৈতিকতা। বুর্জোয়া সংস্কৃতিতেও বিধৃত হয়ে আছে অনুরূপভাবে বুর্জোয়া নৈতিকতা। আর প্রলেতারীয় নৈতিকতা সৃষ্টি করবে সেই সংস্কৃতি যা হবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি। প্রলেতারীয় সংস্কৃতি মহিমান্বিত করে তুলবে প্রলেতারীয় নৈতিকতা যে নৈতিকতা পুরাতনকে ধ্বংস ও নতুন সমাজ গঠনের নৈতিকতা।

মার্কস ও এঙ্গেলস্ বিশ্লেষণ করেছেন যে বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং বুর্জোয়া সমাজের ভাবাবেগগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান এবং উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হবে না। বুর্জোয়া নৈতিকতা প্রধানতঃ দুই ভাবে তার শ্রেণী স্বার্থকে রক্ষা করে। এই নৈতিকতা সম্পত্তির অধিকারকে মহিমান্বিত করে এবং দুই পক্ষের স্বাধীন চুক্তিকেও শ্রদ্ধা দেখায়।

তাই বুর্জোয়া নীতিবোধে সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ কঠোর শাস্তি-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। ঠিক অনুরূপভাবেই চুক্তিভঙ্গকেও গুরুতর অপরাধজনক বলে গণ্য করা হয়, যদি এমনও হয় যে এ ক্ষেত্রে ভঙ্গকারী অত্যন্ত নিঃস্ব এবং সামাজিকভাবে তার অবস্থান অত্যন্ত দুর্বল। তাই দরিদ্র প্রজা ধনী জমিদারের খাজনা ঠিকমত দিতে না পারলে জমি থেকে তার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ আইনসিদ্ধ। এখানে প্রজার দারিদ্র্য বা অসামর্থ্য আইন বা নীতিবোধের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। বুর্জোয়া সমাজে ধনী ও দরিদ্রের পারস্পরিক সম্পর্ক মানবিক নয়—সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক এবং চুক্তিভিত্তিক। আর এই চুক্তির ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের উপর চাপিয়ে দেয় কঠোর সর্তাবলী এবং বুর্জোয়া সমাজের নীতিবোধ অনুযায়ী তা অনুমোদনীয়। বুর্জোয়া সমাজে পুঁজিপতি মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের অমানুষিক শোষণ ও নিষ্পেষণ এবং জমিদার কর্তৃক দরিদ্র কৃষকের উপর নিদারুণ নির্যাতন অনুষ্ঠান—সবই নীতি-সম্মত ও আইনানুগ। এই নীতিবোধের নিরিখেই গঠিত হয় বুর্জোয়া সমাজের আইনগত উপরি কাঠামো। বুর্জোয়া আইন মূলত বুর্জোয়া সম্পত্তি-রক্ষার আইন।

বুর্জোয়া নৈতিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করে। ব্যক্তিগত মেধা, যোগ্যতা, সুযোগ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা বুর্জোয়া নৈতিকতার অনুমোদিত। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বুর্জোয়া সমাজে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড আত্ম-অহমিকা, নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অতি-সচেতনতা এবং

অপরের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীনতা বা এমন কি বিরোধিতা। আবার পাশাপাশি অতিরিক্ত শ্রম-বিভাজনের ফলে শ্রমিকশ্রেণীর আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটায়—শ্রমিককে যন্ত্রের অংশবিশেষে পরিণত করে।

বুর্জোয়া সমাজের অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা ও স্বার্থান্ধতা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামেও প্রভাব বিস্তার করে এবং তাকে কলুষিত করে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রেণীসংগ্রামে উন্নীত হলে সেই সংগ্রাম সামগ্রিক শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করে। কিন্তু আত্ম-স্বার্থ সম্পর্কে অতি-সচেতনতা ট্রেড-ইউনিয়ন সংগ্রামে লিপ্ত শ্রমিকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেও কোন কোন সময় বিভেদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। অর্থনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকের একাংশ অপরাংশের বিরোধিতা করে। এইগুলি বুর্জোয়া নৈতিকতার প্রভাবসঞ্জাত। বুর্জোয়া নৈতিকতার স্বার্থ-সচেতনতা সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যেও কলুষ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনে স্থূল অর্থনীতিবাদের বহুলাংশই এই অতিরিক্ত আত্ম-সচেতনতা থেকে পুষ্টি লাভ করে।

প্রলেতারীয় নৈতিকতা এই স্বার্থান্ধতার বিরোধী। সর্বহারা বিপ্লব শুধু সর্বহারার মুক্তির স্বার্থেই পরিচালিত নয়, সমগ্র মানবসমাজের মুক্তির উদ্দেশ্যেই পরিচালিত। তাই বুর্জোয়া নৈতিকতার আদর্শে যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির সৃষ্টি প্রলেতারীয় সংস্কৃতি সেই বুর্জোয়া সংস্কৃতির রূপান্তর এমনভাবে ঘটায় যে সেই সংস্কৃতি শুধু শ্রমিকশ্রেণীর নয় সমগ্র মানবজাতির অগ্রগমনেই সহায়ক হয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে প্রলেতারীয় সংস্কৃতির ফারাক এখানেই।

কিন্তু প্রলেতারীয় সংস্কৃতিও শ্রেণী-সংস্কৃতি, যদিও এই সংস্কৃতি শুধু প্রলেতারিয়েত নয়—পরিণামে সমগ্র মানবসমাজের সংস্কৃতিতেই উন্নত হয়। সেই মানবসমাজ শোষণ থেকে মুক্ত মানব সমাজ। সেই সমাজ এমন সমাজ যেখানে শ্রেণী শোষণ নেই। প্রলেতারীয় বিপ্লব সমাধা হবার পর কমিউনিস্ট সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়, শুরু হয় কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা—যে সমাজ সম্পূর্ণ শ্রেণীহীন। তারপর যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর এটাই উপলব্ধি করা যায় যে কমিউনিস্ট সমাজ তার অগ্রগতির পথে এমনই একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে যে পর্যায় হবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের উর্দ্ধে এবং উর্দ্ধে শুধু নয়—সেই পর্যায়ে মানুষ শ্রেণীসংগ্রাম বিস্মৃতও হবে। এঙ্গেলস্ একমাত্র সমাজবিকাশের সেই স্তরেই শ্রেণী-নৈতিকতার উর্দ্ধে 'প্রকৃত মানবীয় নৈতিকতা'র প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে উপলব্ধি করেছেন। সেই 'প্রকৃত মানবীয় নৈতিকতা'র বাস্তবরূপ কি হবে তৎকালীন

অর্থনৈতিক সম্পর্কে অস্তিত্বশীল মানুষ তাদের অনুশীলন ও প্রয়োজনবোধের মধ্য দিয়েই তা নির্ধারণ করবে। আর সেই 'প্রকৃত মানবীয় নৈতিকতা' সমন্বিত সমাজে যে সংস্কৃতি বিকাশলাভ করবে তা অবশ্যই কোন শ্রেণীর স্বার্থে প্রযোজ্য হবে না—কারণ শ্রেণীই তখন অস্তিত্বহীন হবে—এমন কি মানসিক শ্রম ও কায়িক শ্রমের পার্থক্যও তখন হবে অবলুপ্ত। উৎপাদন, বণ্টন ও অপরিসীম বুদ্ধিগত বিকাশের সেই সমাজে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে তার সৃষ্টি-কর্তা হবে প্রতিটি মানুষ—কারণ মার্কসের মতে তখন প্রতিটি মানুষই হবে একজন শিল্পী।

১। মার্সিয়ের সেবাি স্ট্রয়েন, ডিক্সানার ড মতস্ নোভো, পল লাফার্গ কর্তৃক তাঁর 'ইভলিউশন অফ প্রপার্টি ফ্রম স্যাভেজ টু সিভিলাইজেশন' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা কর্তৃক প্রকাশিত।

২। পল লাফার্গ, ঐ পৃঃ ৪।

৩। ঐ পৃঃ ১২২।

৪। ফেডারিক্ এঙ্গেলস্, এ্যান্টি-ড্যুরিং পৃঃ ১৩১।

৫। ঐ পৃঃ ১৩২।

৬। ঐ পৃঃ ১৩২—১৩৩।

৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকান্তের উইল।

৮। ঐ

৯। ঐ

১০। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য ও নীতি।

১১। ঐ

১২। ঐ, সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি।

১৩। হেনরিক্ ইবসেন, এ ডলস্ হাউস।

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্ত্রীর পত্র।

১৫। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, এ্যান্টি-ড্যুরিং পৃঃ ১৩০।

১৬। লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস্, ৩১ তম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

১৭। ঐ পৃঃ ২৯৫।

১৮। ঐ

১৯। ঐ পৃঃ ২৮৮।

সপ্তম অধ্যায়

শ্রেণী-সংগ্রাম ও মানবিকতা

মানুষের মুক্তি

প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা আলোচনা করতে যেয়ে মার্কস লিখেছেন যে কমিউনের কাছ থেকে শ্রমিকরা অত্যাশ্চর্য কিছু আশা করে নি। কারণ বিপ্লব একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ এবং মানুষের পরিবর্তন সাধনই বিপ্লবের লক্ষ্য। মার্কস শ্রমিকশ্রেণীর এই ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছেন,

'তারা জানে যে তাদের নিজেদের মুক্তি অর্জনের জন্য এবং সেই সঙ্গে বর্তমান সমাজ তার অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অপ্রতিরোধ্যভাবে যে উন্নততর স্তরের দিকে ধাবমান, তাকে বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম নানান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে এবং তারই সাথে পরিবেশ এবং মানুষেরও রূপান্তর ঘটবে। বর্তমান ধ্বংসোন্মুখ বুর্জোয়া সমাজের গর্ভে যে নতুন সমাজের ভ্রূণ বিদ্যমান তার উপাদান সমূহকে মুক্ত করা ব্যতিরেকে তাদের আর কোন অভীপ্সিত আদর্শ নেই।'[১]

বুর্জোয়া বিপ্লব যেমন সামন্ত অভিজাতদের শ্রেণী শাসনকে পরাস্ত ক'রে কেবলমাত্র বুর্জোয়াশ্রেণীরই জয়যাত্রা সূচিত করেছিল, প্রলেতারীয় বিপ্লব অনুরূপভাবে শুধু প্রলেতারিয়েতের জয়যাত্রা সূচিত করে না—সমগ্র মানবজাতির মুক্তিই প্রলেতারীয় বিপ্লবের লক্ষ্য। পরিবেশ ও মানুষকে রূপান্তরিত ক'রে নতুন পরিবেশ ও মানুষ সৃষ্টি করাই এই বিপ্লবের ঈপ্সিত আদর্শ। কিন্তু বুর্জোয়া আদর্শ ও বুর্জোয়া নীতিবোধ বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায় না। বুর্জোয়া সম্পত্তি সম্পর্কের অবসানের পরও বুর্জোয়া জীবনাদর্শ লুপ্ত হয় না। যে 'যুগসঞ্চিত ক্লেদ' মানুষের চেতনায় গূঢ়তম স্থলে আশ্রয় নিয়েছে তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন করা ছাড়া নতুন পরিবেশ ও নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

নতুন মানুষ সৃষ্টির জন্য বিপ্লব। বিপ্লব মানবজাতির পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য। তাই প্রলেতারীয় বিপ্লব সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক বিপ্লব। এই মানবিকতা বুর্জোয়া অর্থে নয়—প্রকৃত মানবিক অর্থেই মানবিকতা।

মার্কস বলেছেন মানুষের রূপান্তর ঘটাতে হবে ব্যাপক হারে—গণভিত্তিতে। বাস্তব সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়েই মানুষের এই গণভিত্তিক পরিবর্তন সম্ভব—ইতিহাসের সঞ্চিত ক্লেদ দূর করা সম্ভব।[২] এই পরিবর্তন সাধন করবে সর্বহারা শ্রেণী, মার্কস যাদের বলেছেন মানবসমাজের সর্বাপেক্ষা বিচ্ছিন্নতা-প্রাপ্ত (এ্যালিয়েনেটেড) অংশ, মানবতা থেকে যারা সর্বাধিক বঞ্চিত এবং তারাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেদের মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানব-জাতিকেও মুক্ত করবে। যে সর্বহারারা মানব মুক্তি সাধন করবে তারা শুধু বস্তুগত দিক দিয়েই বঞ্চিত নয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তারা বঞ্চিত। তাই অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে, বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বঞ্চিত এবং সর্বাপেক্ষা বিচ্ছিন্নতা-প্রাপ্ত ও 'মনুষ্যত্ব বিহীন' (ডিহিউম্যানাইজড) স্তরে অধঃপতিত সর্বহারাদের দ্বারা মানব-মুক্তির বিপ্লব কি ভাবে সংঘটিত হতে পারে? কারণ মার্কস-এর মতে প্রলেতারীয় বিপ্লব তো কোন অন্ধ বিদ্রোহ নয়, এই বিপ্লব যারা সংঘটিত করে তারা সুপরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তা করে। লুডাইটদের মত তারা শুধু হতাশা ও ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটায় না, তারা এই সচেতনতা নিয়েই বিপ্লব সংঘটিত করে যে, যা ধ্বংস করা হচ্ছে উন্নততর কোন ব্যবস্থা দিয়েই তার স্থান পূরণ করা হবে।

প্রশ্নটা বিচার্য ধনতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক মূল্যায়নের পরি-প্রেক্ষিতেই। এখানে স্মর্তব্য মার্কস-এর সেই বিশ্লেষণ—'বস্তুজগতের মূল্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজগতের অবমূল্যায়ন ঘটে'। এই অবমূল্যায়িত মানবসমাজই হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজ। মানবের এই অবমূল্যায়নই মানবকে 'মনুষ্যত্ব-বিহীন' ক'রে তোলে—মানবের মানবিক গুণাবলীর অবসান ঘটিয়ে দেয়। প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি, হৃদয়ের কমনীয়তা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, স্বার্থত্যাগ—ইত্যাদি সমগ্র মানবিক গুণাবলী—যে গুণাবলী জন্তুজগতের সঙ্গে মানবজগতের পার্থক্য নির্দেশ করে—তার অবসান ঘটিয়ে মানুষকে 'মনুষ্যত্ব-বিহীন' করে তোলে বুর্জোয়া সমাজ। বুর্জোয়া সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রধান সম্পর্ক—অর্থের বন্ধন। বুর্জোয়া সমাজে যে মানুষ শ্রমিক তার মানবিক গুণাবলীর অস্তিত্ব ততক্ষণই বিরাজমান যতক্ষণ সেই গুণাবলী মূলধনের জন্য বিরাজ করে, যে মূলধন আবার শ্রমিক থেকে বিচ্ছিন্ন। মার্কস এভাবেই মানবিক গুণাবলীর অস্তিত্বশীলতার ব্যাখ্যা করেছেন।

বস্তুতঃ পূর্বতন সমাজব্যবস্থাগুলিতে এবং বর্তমান বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায়

সামাজিক শ্রমের যে পদ্ধতি চলে আসছে তা মানুষকে মনুষ্যত্ব-হীনতার স্তরে অধঃপতিত করে। সামন্তযুগীয় সামাজিক শ্রমের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হত অত্যাচারীর মুগুরের আঘাতে। মুষ্টিমেয় জমিদারের স্বৈরাচারে হৃতসর্বস্ব শ্রমজীবী জনগণ একদিকে যেমন নিষ্পেষিত হত অপরদিকে তেমনি তারা সমস্ত জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকত। ধনতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক শ্রমের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিকের বুভুক্ষার উপর। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমস্ত প্রগতি সত্ত্বেও সর্বাপেক্ষা উন্নত, সভ্য এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণ, কারখানার শ্রমিক বা কৃষিক্ষেত্রের কৃষকসমাজ নিষ্পেষিত মজুরীদাস এবং স্বৈরাচারের শিকার হয়েই সমস্ত জ্ঞানালোক থেকে বঞ্চিত হ'য়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। একদিকে শ্রমজীবী জনগণের এই অবদমিত ও অবমূল্যায়িত সামাজিক অবস্থান. অপরদিকে বুর্জোয়া সমাজের উপর তলায় একমাত্র নগদ মুদ্রার বন্ধনে আবদ্ধ সামাজিক সম্পর্ক এবং মুনাফার দুর্নিবার প্রেরণা সমগ্র সমাজের চরিত্রটাকেই 'মনুষ্যত্ব হীন' করে তোলে—সমাজকে করে তোলে হৃদয়-হীন, আবেগ ও অনুভূতি হীন।

এইরকম পরিস্থিতিতে যে শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক অবস্থানে সর্বাপেক্ষা বিপ্লবী শ্রেণী হিসাবে বিপ্লব সংগঠনে অগ্রসর হবে—পুরাতনকে ধ্বংস করে নতুনের প্রতিষ্ঠা করবে, সেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সর্বাধিক প্রয়োজন হয়ে পড়ে আদর্শ ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে নিজেকে সুশিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? লেনিন এর উত্তরে বলেছেন,

'সমস্ত দেশের ইতিহাস এটাই দেখিয়ে দেয় যে শ্রমিকশ্রেণী একমাত্র তার নিজস্ব প্রচেষ্টায় কেবল ট্রেডইউনিয়ন চেতনারই বিকাশ ঘটাতে পারে……। সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব, সম্পত্তিবান শ্রেণীসমূহের শিক্ষিত প্রতিনিধি যাঁরা বুদ্ধিজীবী —তাঁদের বিশ্লেষিত দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সমাজ থেকেই এসেছিলেন।'[৩]

বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আহরিত জ্ঞানভাণ্ডারের সাহায্য নিয়েই শ্রমিক শ্রেণীকে নিজের সুশিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে প্রাথমিকভাবে। কিন্তু এরই সঙ্গে বিবেচ্য যে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরিচালনা করবে প্রলেতারিয়েতের

রাজনৈতিক পার্টি—যে পার্টি গঠিত হবে প্রলেতারিয়েতদের মধ্য থেকে বাছাই করা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের দ্বারা। বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যেমন শ্রমিকশ্রেণীকে জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে, তেমনি লেনিন অন্যত্র সতর্ক করে দিয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হচ্ছে তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে ফারাক সৃষ্টি। বিপ্লবী কর্মীরা তাই যেমন বিপ্লব সংগঠনে নিজেকে ব্যাপৃত করবে তেমনি লেনিনের ভাষায় 'এটা হবে একটা দারুণ ভ্রান্তি যদি কেউ এই সিদ্ধান্তে আসে যে মানবজাতির সঞ্চিত জ্ঞানরাশি আয়ত্ত না করেই নিজেকে একজন কমিউনিস্ট হিসাবে গড়ে তোলা যায়।'[৪]

কাজেই আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, বিপ্লবী কর্মীরা এই দায়িত্ব পালন করলেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। প্রলেতারীয় বিপ্লবে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব প্রধানত: এই নিরিখেই বিবেচ্য কারণ এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই পুরাতন সমাজের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলির মূলোচ্ছেদ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার অপেক্ষা রাখে। পুরাতন সমাজের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি দূর করেই নতুন সমাজ গড়ে তোলা যায়। কিন্তু বুর্জোয়া জগৎ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে অবিরাম যে চেতনার সৃষ্টি করে তা সর্বদাই বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। এঙ্গেলস্ এই অবস্থাকে বলেছেন 'একটা ভ্রান্ত চেতনার অধিকারী হওয়া'। বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ, দার্শনিক প্রমুখরা এবং বুর্জোয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রচার মাধ্যমগুলি যে চেতনার প্রসার ঘটিয়ে থাকে তাতে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় শ্রমজীবী জনগণের অমানবিক সামাজিক অবস্থানকে বহুলাংশে স্বীকার করে নিয়েও প্রায়শই সমস্যা সমাধানে ভ্রান্ত পথের নিশানা দেয়। যেমন ভারতে এরা শিক্ষা দেয়—যে হস্তশিল্প, খাদি, চরকা ইত্যাদির মধ্যে প্রত্যাবর্তন করলে এই অমানবিক অবস্থানের অবসান ঘটতে পারে। এই প্রচারে শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাধানের ভ্রান্ত পথ দেখানো হয়। এটা চেতনার স্তরে সামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন বটে, কিন্তু যথার্থ প্রতিফলন নয়। জনগণের চেতনায় এই প্রতিফলন 'উল্টে দেওয়া' প্রতিফলন, এটা আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। শ্রমজীবী জনগণের দুর্দশার প্রতিফলন সঠিক—কিন্তু সমাধানের পথ ভ্রান্ত। ফলে যে শ্রমিকের চেতনায় এই ভ্রান্তি থাকে সে শ্রমিক হলেও বুর্জোয়া আদর্শের দ্বারা

পরিচালিত। শাসকশ্রেণী সর্বদাই জনগণের মনে এই ভ্রান্ত চেতনা সৃষ্টিতে সচেষ্ট। সমগ্র বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা এই লক্ষ্যে পরিকল্পিত। বুর্জোয়া সমাজে শিশুর জন্মের পর থেকেই যে জীবনবোধ সৃষ্টি করা হয় তা এই ভ্রান্ত চেতনারই সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় প্রচার ব্যবস্থা, বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এবং জনগণের বৃহদংশের সঙ্গে কৃষক জীবনের সম্পর্ক এই ভ্রান্ত চেতনার পরিপুষ্টি ঘটায়। জগৎ সম্পর্কে ভ্রান্ত চেতনার অবসান ঘটিয়ে যথার্থ চেতনা সৃষ্টি, মানবীয় বিশ্ব-বীক্ষায় জনগণকে সচেতন করা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সর্বাপেক্ষা জরুরী দায়িত্ব।

মানুষের যথার্থ মুক্তি তাই নির্ভর করে জগৎ সম্পর্কে যথার্থ চেতনা সৃষ্টির উপরই। *দর্শন*, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদিকে ‘আত্মসচেতনতা’ আখ্যা দিয়ে অনেক দার্শনিক এই ‘আত্মসচেতনতা’ই মানুষের মুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট পথ বলে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। মার্কস এই সমস্ত অসার ও ভ্রান্ত বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ করে মন্তব্য করেছেন,

“আমরা অবশ্যই আমাদের বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করার কোন চেষ্টা করব না যে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানাবিধ জঞ্জালস্তূপকে ‘আত্মসচেতনতা’ অ্যাখ্যা দিয়ে ‘মানুষ’-এর ‘মুক্তি’র পথে এক পাও অগ্রসর হওয়া যাবে না বা এই সব বাক্যের আধিপত্য থেকে ‘মানুষ’কে মুক্ত করেও তা করা যাবে না কারণ মানুষ এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা কখনই মন্ত্রমুগ্ধ হয় নি। আমরা এটাও ব্যাখ্যা করব না যে প্রকৃত মুক্তি এই বাস্তব জগতেই সম্ভব এবং তা বাস্তব পদ্ধতিতেই। স্টীম এঞ্জিন এবং মিউল জেনী ব্যতিরেকে দাস-ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যেতে পারে না, উন্নত কৃষিপদ্ধতি ব্যতিরেকে ভূমিদাসত্বের অবসানও ঘটানো যেতে পারে না এবং সাধারণভাবে যতক্ষণ না মানুষ খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী প্রয়োজনীয় অনুপাত ও উৎকর্ষতায় সংগ্রহ করতে পারে ততক্ষণ তারও মুক্তি সাধিত হতে পারে না। ‘মুক্তি’ একটা ঐতিহাসিক কর্ম, মানসিক নয় এবং *ঐতিহাসিক* অবস্থার মধ্য *দিয়েই* এর বাস্তবায়ন ঘটে।...এবং তারপর *বিকাশের বিভিন্ন* স্তর অনুযায়ী তারা বিষয়বস্তু, আত্মসচেতনতা, খাঁটি সমালোচনা, ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার অসারতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বিকাশ যখন যথেষ্ট অগ্রসর হয় তখন এইগুলি থেকেও তারা নিজেদের মুক্ত করে।”[৫]

বিকাশের সেই স্তরে মানুষ প্রকৃতই বস্তুবাদী বিশ্ব-বীক্ষায় আলোকিত হয়। মার্কস যা আরো বলেছেন, 'পুরাতন বস্তুবাদের ভিত্তি ছিল নাগরিক সমাজ; নতুন বস্তুবাদের ভিত্তি মানব সমাজ বা সামাজিক মানবতা'।[৬] বুর্জোয়া মানবতার ভণ্ডামীপূর্ণ স্তর থেকে এই প্রক্রিয়াতেই প্রকৃত মানবতার স্তরে উত্তরণ ঘটে।

মানবিক অধিকার

'সাম্য', 'মৈত্রী' ও 'ভ্রাতৃত্ব'—এই মানবীয় নীতিগুলিকে সামনে রেখেই ফরাসী বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছিল। ইতিহাস প্রমাণিত করেছে, সামন্ত অভিজাতদের অনুরূপ বুর্জোয়াদেরও সমান সুযোগ সুবিধার নীতিই বিধৃত হয়েছিল এই সাম্যের দাবিতে। 'মৈত্রী' ও 'ভ্রাতৃত্ব'—সামন্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর পিছনে সমগ্র কৃষক সমাজকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছিল ঐ রণধ্বনি দুইটি। বস্তুতঃ এই তিনটি রণধ্বনিই বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই উদ্ভাবিত হয়েছিল।

বুর্জোয়া সভ্যতায় 'সাম্য' 'মৈত্রী' ও 'ভ্রাতৃত্বে'র স্থান কোথায়? নারী-পুরুষে অসাম্য, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অসাম্য, জাতিতে জাতিতে অসাম্য। এবং শুধু অসাম্য নয় বর্ণবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, জাত্যাভিমান ইত্যাদিই বুর্জোয়া সমাজের বৈশিষ্ট্য।

সমতার আদিম ধারণা এটাই ছিল যে মানুষ হিসাবে মানুষদের মধ্যে একটা সাধারণ গুণ বিদ্যমান থাকে এবং তাই মানুষে মানুষে সমান। কিন্তু আধুনিক কালে সমতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানুষই সমান এবং তাই প্রতিটি মানুষেরই সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা থাকা চাই।

প্রাচীনতম সমাজে সমানাধিকার সাধারণতঃ একই সমাজভুক্ত—পুরুষ-মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হত। স্ত্রীলোক, দাস এবং অন্য সমাজভুক্ত মানুষরা এই সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হত। প্রাচীন গ্রীক ও রোম সমাজে মানুষে মানুষে অসমতাই সমতা থেকেও অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালেএটা বাতুলতা বলেই মনে হত যে গ্রীক স্বাধীন নাগরিক এবং গ্রীসের দাসরা সমান অধিকার ভোগ করবে বা রোমান স্বাধীন নাগরিক ও রোমান প্রজাদের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকবে। রোমসাম্রাজ্যে কালক্রমে এই বৈষম্য লুপ্ত

হতে লাগল এবং একমাত্র স্বাধীন নাগরিক ও দাসদের মধ্যেই অধিকারের বৈষম্য বজায় থাকল। ব্যক্তি নাগরিকের সমান অধিকারও স্বীকৃত হল এবং তার ভিত্তিতেই রোমান আইনশাস্ত্রও প্রণীত হল। এই রোমান আইনই ছিল সম্পত্তিভিত্তিক সমাজের বিস্তৃত আইনের বন্ধন। কিন্তু যতদিন স্বাধীন নাগরিক ও দাস—এই দুই পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠির অস্তিত্ব বজায় রইল ততদিন মানবসমাজের সাধারণ সাম্যের কোন আইনগত ব্যবস্থা অকল্পনীয় ছিল।

এঙ্গেলস্ শ্লেষ করে বলেছেন যে খৃষ্টীয়-ধর্ম সমস্ত মানুষ যে সমান তা কেবলমাত্র একটা বিষয়েই বিশ্বাস করত—তা হ'ল সমস্ত মানুষই সমানভাবে আদিম পাপের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। অবশ্য খৃষ্টীয় ধর্মের প্রথম যুগে ক্রীতদাস ও নিষ্পেষিতদের মধ্যে এই ধর্মের প্রসারে এই তত্ত্ব বেশ কার্যকরই হয়েছিল। খৃষ্টীয় ধর্মের ঐ প্রাথমিক কালে সমষ্টিগত মালিকানার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু তা প্রকৃত সাম্যের তাৎপর্য সমন্বিত ছিল না। আসলে নিপীড়িতদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টির জন্য ঐ আপাত সাম্যের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু অবিলম্বেই পুরোহিত ও সাধারণ খৃষ্টানদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় সাম্যের ঐ ভ্রূণাবস্থারও অবসান ঘটল।

ভারতে অবশ্য বেদ-উপনিষদে চাতুর্বর্ণের বিধান সাম্যের ধারণাকে প্রথম যুগেই বিলুপ্ত করে দিয়েছে। মুসলমান ধর্মে অবশ্য মুসলিম ভ্রাতৃত্বের একটা ধারণা প্রথম থেকেই ছিল।

তারপর যখন জার্মানরা সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ ছেয়ে ফেলল তখন এ অঞ্চলে যে জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ তৈরী হ'ল তা সাম্যের যুগসঞ্চিত সমস্ত ধারণাকেই ধূলিস্যাৎ করে দিল। কিন্তু জার্মানদের অভিযানের ফলে ইতিহাসের বিকাশের ধারায় এই সর্বপ্রথম পশ্চিম ইউরোপ ও মধ্য ইউরোপ মিলিয়ে একটা সুসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র তৈরী হল এবং এই সর্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে কতকগুলি জাতীয় রাষ্ট্রও উদীয়মান হল। আর এই রাষ্ট্রগুলি একে অপরের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করতে লাগল, তেমনি একে অপরকে সংযত রাখার কাজেও ব্যাপৃত রইল। ইতিহাসের ক্রমবিকাশের এই ধারাতেই একটি প্রকৃত ভিত্তিভূমি রচিত হল যেখানে মানুষের সমান মর্যাদা এবং সমান অধিকারের প্রশ্ন পরবর্তীকালে উদিত হল।

মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের গর্ভেই পরবর্তীকালে একটি শ্রেণীর উদ্ভব হল

কালের যাত্রায় যে শ্রেণী আধুনিক সাম্যের দাবির পতাকা বহন করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হল। কিন্তু বুর্জোয়াদের এই সাম্যের দাবি যে সামন্ত অভিজাতদের সঙ্গে সমান সুযোগসুবিধার নিরিখেই উত্থাপিত হল তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন হল একদল স্বাধীন শ্রমিকের যারা নিজেদের শ্রমশক্তিকে ভাড়া খাটাবার জন্য পুঁজিপতিদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারত। আর চুক্তির সর্তের নিরিখে সে মালিকের সঙ্গে সমান অধিকারেরও দাবিদার ছিল। পরিশেষে অজ্ঞাতে হলেও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে মানব-শ্রমের সমান মর্যাদা স্বীকৃত হল কারণ বুর্জোয়া অর্থনীতিতে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় ঐ পণ্যে বিধৃত সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারাই।

কিন্তু অর্থনৈতিক সম্পর্ক যে স্বাধীনতা এবং সমানাধিকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল তার বিরোধী। সামন্তবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্তি এবং সামন্তযুগীয় অসাম্যের অবসান ঘটিয়ে সমানাধিকারের দাবি কালক্রমে ব্যাপকতর রূপ গ্রহণ করল। বিশেষ করে, ইউরোপের মানুষ যখন রোম সাম্রাজ্যের মত কোন একটা বিশেষ সাম্রাজ্যের অধীন নাগরিক হিসাবে রইল না, পৃথক পৃথক স্বাধীন নাগরিকে পরিণত হল, এবং পৃথক রাষ্ট্রগুলি সমান মর্যাদার ভিত্তিতেই পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হল, তখন স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবি বিশেষ রাষ্ট্রের গণ্ডী অতিক্রম করে মানবিক অধিকার হিসাবেই উন্নীত হ'ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানবিক অধিকারের আসল বুর্জোয়া রূপও পরিস্ফুটিত হয়ে উঠল। এঙ্গেলস্ তাঁর বিশ্লেষণে দেখিয়ে দিলেন যে বুর্জোয়ারা যখন এই মানবিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠল তখন আমেরিকায় কালো মানুষদের ক্রীতদাসত্বও ন্যায়সঙ্গত বলে আমেরিকার সংবিধানে স্বীকৃত হল। 'শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা নিষিদ্ধ হল, জাতিগত সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত হল।'[৭]

কিন্তু ইতিহাসের বিকাশে বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীরও যেমন জন্ম হল, তেমনি বুর্জোয়াদের সমতার দাবির সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েতদের সমতার দাবিও ধ্বনিত হতে শুরু করল। যে মুহূর্ত থেকে বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা অবসানের দাবি উত্থাপন করল সেই মুহূর্ত থেকে প্রলেতারিয়েতরাও পুরোপুরি শ্রেণী-বিভেদেরই অবসান দাবি করল। প্রথম পর্যায়ে খৃষ্টীয় ধ্যানধারণায় প্রভাবান্বিত হয়েই তারা এই

দাবি উত্থাপন করেছিল, পরবর্তীকালে বুর্জোয়াদের সমানাধিকারের তত্ত্বকে আশ্রয় করেই তারা অগ্রসর হল। বুর্জোয়াদের প্রচারে প্রথমদিকে প্রলেতারিয়েতরা বিশ্বাসস্থাপন করেছিল এবং দাবি করেছিল সমতা শুধুমাত্র বাহ্যিক হলেই চলবে না, বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হওয়া চাই এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তা প্রসারিত করতে হবে। বিশেষ ক'রে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যখন বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রীয় সমতার প্রশ্নকে জোরালো আকারে তুলে ধরল, তখন ফরাসী প্রলেতারিয়েতরাও পাল্লা দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য দাবি করল এবং এই দাবি ফরাসী প্রলেতারিয়েতদের রণধ্বনিতে পরিণত হল।

ইতিহাসের এই প্রেক্ষাপটকে স্মরণে রেখেই এঙ্গেলস্ বিশ্লেষণ করলেন,

'প্রলেতারিয়েতদের কণ্ঠে এই সমতার দাবির তাই দুটো অর্থ আছে। এটা হতে পারে, যেমন বিশেষ করে একেবারে সূচনা থেকেই—উদাহরণস্বরূপ কৃষক যুদ্ধের সময়ে—উৎকট সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে, ধনী-দরিদ্র, সামন্ত-প্রভু ভূমিদাস এবং অতিভোজন—বিলাসী ও বুভুক্ষুদের বৈপরিত্যের বিরুদ্ধে একটা স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া; এবং এদিক থেকে এটা একটা বিপ্লবী প্রবণতারই বহিঃ-প্রকাশ, আর এই বহিঃপ্রকাশের মধ্যেই রয়েছে এর যাথার্থ্যতা। অথবা, বিপরীতপক্ষে, এই দাবি বুর্জোয়াদের সাম্যের দাবির প্রতিক্রিয়া হিসাবে আবির্ভূত। এই বুর্জোয়া দাবি থেকে আরো অনেক মোটামুটি সঠিক ও সুদূরপ্রসারী দাবিরও প্রেরণা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুঁজিপতিদের নিজেদের বক্তব্যগুলিকে ব্যবহার করেই পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সংগ্রাম পরিচালনার জন্যও এই দাবিগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে……। উভয়ক্ষেত্রেই প্রলেতারিয়েতদের এই সাম্যের দাবির মর্মবস্তু হল শ্রেণীবিভেদ বিলোপেরই দাবি।'[৮]

এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ এবং সাম্যের দাবির সমগ্র ক্রমবিকাশ অনুধাবন-করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীতেই হোক অথবা প্রলেতারীয় দৃষ্টিভঙ্গীতেই হোক, সাম্যের এই দাবি একটা ঐতিহাসিক বিকাশেরই ফলশ্রুতি এবং এর আবির্ভাবের পশ্চাতে রয়েছে কতকগুলি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সর্ত ও এক সুদীর্ঘকালীন ইতিহাস।'

কিন্তু বুর্জোয়া সভ্যতা প্রথমযুগে সাম্যের বাণীকে ঊর্দ্ধে তুলে অগ্রসর হলেও পরিণামে এই সাম্যের বাণী অন্তঃসারশূন্য নীতিবাক্য হিসাবেই পরিগত

হয়েছে। কারণ সামন্ত অভিজাতদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ের পর এবং তারপর বিশেষ করে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তরণের পর সাম্যের পরিবর্তে, অসাম্য, জাত্যাভিমান, জাতিবিদ্বেষ ও বর্ণবিদ্বেষই বুর্জোয়া সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কালো-সাদার বিভেদ, কালো মানুষের প্রতি সাদা মানুষের ঘৃণা, ইহুদি বিদ্বেষ, আর্য-অনার্য ভেদাভেদ, পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যের প্রতি অবজ্ঞাসুলভ মনোভাব, ভারতীয় উপমহাদেশে সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানি—মানবজাতির মধ্যে এই সমস্ত-প্রকার ভেদাভেদই, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার বিশেষ বিশেষ কারণ যাই থাক না কেন, আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতারই অবদান। মানুষে মানুষে এই বিদ্বেষের প্রভাব সমগ্র বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে কলুষিত করে তুলেছে। মানুষের ভাবধারা, আবেগ, অনুভূতিকে জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মগত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রেখে তার সার্বজনীন রূপকেই ব্যাহত করেছে। মানুষের যে মুক্তির কথা, মানবিক যে অধিকারের কথা মার্কস ও এঙ্গেলস্ নির্দেশ করে গিয়েছিলেন, এক উন্নততর সমাজব্যবস্থায় তার বাস্তবায়নের যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত তাঁরা দিয়ে গিয়েছিলেন বুর্জোয়া সভ্যতার এই বিকার তার যাত্রাপথকে নিদারুণভাবে ব্যাহত করে তুলেছে।

শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে সাহিত্যরচনায় এই বিকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করার এক বিরাট সম্ভাবনার কথাও এক্ষেত্রে বিস্মৃত হওয়া যাবে না। নৈতিকতা, মানবীয় মূল্যবোধ, মানবিক অধিকার ও পরিপূর্ণ মানব-মুক্তি—এই সামগ্রিক বিষয়কে এড়িয়ে যেয়ে প্রলেতারীয় বিপ্লব তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। কারণ বুর্জোয়া সভ্যতা মানব-সভ্যতার এই সমস্ত দিকগুলিকে পদদলিত করে মানুষে মানুষের সম্পর্ক একমাত্র অর্থের বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। বস্তুতঃ বুর্জোয়াযুগের উন্মেষের কালেই বুর্জোয়াদের এই জাতিবিদ্বেষ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সাহিত্যে নিদারুণ কষাঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল।

উইলিয়ম শেকস্পীয়র জন্মলাভ করেছিলেন দুইটি যুগের সংগম মুহূর্তে সামন্তবাদী যুগ বিদায় নিচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া যুগের উন্মেষ ঘটছে—এমনি একটা সময়ে শেকস্পীয়র তাঁর লেখনী ধারণ করেন। ফলে এই উভয় যুগেরই দোষ-ত্রুটিগুলি শেকস্পীয়রের দৃষ্টিতে এসেছিল এবং তাঁর নাটকে ঐগুলি হয়েছিল তীব্র সমালোচনার বিষয়বস্তু। যদি 'ওথেলো' নাটকের

কথাই ধরা যায়, তবে দেখা যাবে যে তিনি একজন কালো আফ্রিকান 'ওথেলো'কে এমন একটা যুগে তাঁর নাটকে প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ করালেন যখন একদিকে সামন্তযুগীয় বংশমর্যাদা ইত্যাদি এবং নবোন্মেষিত বুর্জোয়া সভ্যতায় কালো মানুষদের প্রতি ঘৃণা—দুটো ধারাই ইউরোপীয় সমাজে সমভাবে বহমান। এমনি একটা যুগমুহূর্তে তিনি ভেনেসীয় অভিজাতদের তুলনায় নৈতিকতায়, বুদ্ধির প্রাখর্যে এবং শৌর্যে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ ক'রে এক আফ্রিকান নায়ককে তাঁর নাটকের প্রধান ভূমিকায় নিয়ে এলেন। সাহিত্য-রচনায় সার্বজনীন মানবিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ এক অতুলনীয় নিদর্শন। শুধু তাই নয়, রাজসভায় দাঁড়িয়ে ডেসডেমোনা যে ভাষায় এবং যে আবেগে তাঁর পিতা ও রাজ-পারিষদবর্গের সম্মুখে তাঁর কালো-আফ্রিকান স্বামীর প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা ঘোষণা করল, তা নারীর কর্তব্যবোধ শুধু নয়, কালো হোক সাদা হোক—মনুষ্যত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। পিতার প্রশ্ন এবং তার উত্তরে ডেসডেমোনার উক্তিটি এখানে উল্লেখনীয় :

'Brabantio : I pray you hear her speak,
If she confess that she was half the wooer,
Destruction on my head if my bad blame
Light on the man ! Come hither, gentle mistress.
Do you perceive in all this noble company
Where most you owe obdience ?
Desdemona : My noble father,
I do perceive here a divided duty :
To you I am bound for life and education ;
My life and education both do learn me
How to respect you ; you are the lord of
duty—
I am hitherto your daughter ; but here's
my husband,
And so much duty as my mother show'd
To you, preferring you before her father,
So much I challenge that I may profess
Due to the Moor, my lord.'[৯]

রাজপরিষদে দাঁড়িয়ে একজন কালো-আফ্রিকান স্বামীর প্রতি কর্তব্য-বোধের যে বাণী অভিজাত পারিষদের কন্যা ডেসডেমোনার কণ্ঠে ঘোষিত হল,

পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের সমানাধিকারের সংগ্রামে তা অতুলনীয় সাহিত্য কীর্তি হিসাবেই ভাস্বর হয়ে থাকবে।

'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে শেকস্‌পীয়র মানবাধিকারের প্রশ্নটিকে আরো প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই যে সমান মানবিক মর্যাদার অধিকারী এবং জাতিগত, বর্ণগত বা ধর্মগত নির্যাতন বা নিগ্রহ তা যে কোন মানুষের উপরই হোক না কেন, তা যে সমভাবেই বেদনাদায়ক শেকস্‌পীয়র তাঁর এই নাটকে সেই বিষয়টিকে সুতীব্র অনুভূতির সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। শাইলক জাতিতে ইহুদি এবং স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত নীচ ও শঠ। কিন্তু ইহুদি শাইলক খৃষ্টানদের নিগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য একজন চুক্তিবদ্ধ খৃষ্টানের দেহের মাংসখণ্ড কেটে নেবার সমর্থনে যে যুক্তি উত্থাপন করল তা সেই নীচ ইহুদির কণ্ঠনিসৃত হলেও জাতি ও ধর্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ছিল এক তীক্ষ্ণতম প্রতিবাদ।

শাইলককে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ ব্যক্তির দেহের মাংসখণ্ড নিয়ে তোমার কি লাভ হবে? তার উত্তরে শাইলকের উক্তি,

'Shylock: To bait fish withal. If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgrac'd me and hind'red me half a million; laughed at losses, mock'd at my gains, scorned my nation, thwarted my bargain, cooled my friends, heated mine enemies. And what's his reason? I am a Jew. Hath not Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the some food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?,'[১০]

মানুষ হিসাবে প্রতিটি জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নটিকে শাইলকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যে তীব্রতার সঙ্গে শেকস্‌পীয়র তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে, বিশ্ব-সাহিত্যে এর কটি তুলনা আছে জানা নেই। বিশেষ করে সেই যুগের মানদণ্ডে এই বক্তব্য তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শেকস্‌পীয়র যে মহত্তম শিল্পগুণের পরিচয় দিয়েছেন তা নিসন্দেহেই অত্যাশ্চর্য।

সমান মানব অধিকারের প্রশ্নে এই সাহিত্য সৃষ্টি সুনিশ্চিতভাবেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের সহায়ক। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুরূপ রচনা বিপ্লবের অগ্রগমনের সহায়ক ভূমিকাই পালন করবে। আধুনিক কালে পল রবসন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীরা মানবিক শিল্প রীতির এই ঐতিহ্যকেই আরো এগিয়ে নিয়ে বিপ্লবের স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করেছেন।

'মনুষ্যত্ব হীনতা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অর্থের সম্পর্কই বুর্জোয়া সভ্যতায় পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মূল কথা। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে মার্কস লিখেছেন, 'বুর্জোয়ারা পরিবার থেকে আবেগ অনুভূতির সমস্ত আবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে, এবং পারিবারিক সম্পর্ক নিছক অর্থের সম্পর্কে নামিয়ে এনেছে।'[১১]

মার্কস যখন পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন তারপর অবস্থার আরও রূপান্তর ঘটেছে। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সম্পর্ক মানবের অবমূল্যায়ন সাধন করে। এই অবমূল্যায়ন পরিবারের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য এবং শুধু প্রযোজ্য নয়, এই অবমূল্যায়ন পরিবারের ক্ষেত্রে আবাহন করে নিয়ে এনেছে এক সুগভীর সংকট। বুর্জোয়া অর্থনীতির সৃষ্ট মানুষের 'মনুষ্যত্ব হীনতা'র প্রক্রিয়া পারিবারিক জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে, আর বৃহত্তর সামাজিক জীবনে নিয়ে এসেছে নিদারুণ স্বার্থান্ধতা ও একাকীত্ব। আদর্শগত দিক দিয়ে এই সংকটের তুলনা নেই। নারীদের ক্ষেত্রে আপাত দৃষ্টিতে কতকগুলি অধিকার যেমন চাকুরীর অধিকার, সমান বেতনের অধিকার (যদিও সর্বত্র নয়), বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার, জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং একই প্রয়োজনে গর্ভপাতের অধিকার—ইত্যাদি অর্জিত হলেও স্বামি-স্ত্রীর প্রেম, পুত্র-কন্যার সঙ্গে পিতা-মাতার স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্নেহ ও সখ্যতার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিলতর হতে শুরু করেছে। যে সমস্ত পারিবারিক রীতি ও ঐতিহ্য পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে রেখেছিল সেই রীতি ও ঐতিহ্যগুলি ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু উন্নততর নতুন কোন রীতি বা বন্ধন তার স্থান গ্রহণ করছে না। ফলে এক নিদারুণ নৈতিক সংকটে পরিবারগুলি আক্রান্ত। পরিবার ভুক্ত মানুষদের মধ্যে এবং পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে স্বার্থান্ধতা, উন্নাসিকতা ও অমানবিকতার তীব্রতা সৃষ্টিই এর সামগ্রিক ফলশ্রুতি।

সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রে এর প্রভাব প্রকট হয়ে উঠেছে আরও গুরুতর রূপে।

ভারতীয় পরিবারগুলি এবং ভারতীয় সমাজও একই ব্যাধিতে আক্রান্ত। ফলে এযাবৎকালের ঐতিহ্যবাহী সমগ্র পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলিই বিলীয়মান হয়ে পড়েছে।

এই ধ্বংসোন্মুখ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের বিকল্প নতুন ও উন্নততর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা একমাত্র প্রলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যেই নিহিত।

রুশ ও চীন বিপ্লবে এবং বিপ্লবোত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে যেগুলি এই নৈতিক সংকট সমাধানে সহায়ক। বুর্জোয়া সমাজের অর্থলোলুপতা, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বার্থান্ধতা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও কু-প্রভাব বিস্তার করে না তা নয়। আবার ট্রেডইউনিয়ন সংগ্রাম যদি নিছক অর্থনীতিবাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে তার থেকেও এই কদর্যতাগুলি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে প্রশ্রয় পায়। সমাজের স্বার্থকে, বহুর স্বার্থকে উপেক্ষা করে ব্যক্তির স্বার্থ বৃহত্তর হয়ে ওঠে এবং তা শ্রমজীবী জনগণের কোন কোন অংশকেও কলুষিত করতে পারে। এই অনৈতিকতাগুলি বিশেষ প্রকট হয়ে ধরা পড়ে বিপ্লবোত্তর কালে।

রুশ বিপ্লবের পর লেনিন ও বলশেভিক পার্টি এই সম্পর্কে কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট স্যাটারডের প্রচলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তাহে প্রতিটি শনিবার শ্রমিকরা বিনা বেতনে শ্রম প্রদান করবে—এটাই ছিল কমিউনিস্ট স্যাটারডের মূল বিষয়। কিন্তু এর নৈতিক দিকটাই ছিল সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ। বুর্জোয়া সমাজে অর্থের বিনিময় ব্যতিরেকে কোন কর্ম সম্পাদন হয় না। কারণ এই সমাজ ব্যক্তিস্বার্থভিত্তিক। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য সমগ্র শ্রমজীবী সমাজের কল্যাণ সাধন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনে শ্রমজীবী জনগণের কঠোর শ্রমই ছিল প্রধান মূলধন। তাই যদিও সমাজতন্ত্র পরিণামে কাজের ঘণ্টা হ্রাস করে আনবার লক্ষ্য নিয়েই অগ্রসর হয় এবং বর্তমান রুশ সমাজে তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর করাও হচ্ছে, কিন্তু বিপ্লবের পরমুহূর্তেই যা প্রয়োজনীয় বোধ হয়েছিল তা ছিল শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি করা। কারণ অতিরিক্ত শ্রম ছাড়া সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। পার্টির পক্ষ থেকে সপ্তাহের প্রতি শনিবার বিনা মজুরিতে কাজ করবার জন্য কমিউনিস্ট

কর্মী ও সমর্থকদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। এই আহ্বান কার্যকর করার আবেদন জানিয়ে লেনিন যে বক্তব্য শ্রমিকদের কাছে হাজির করেছিলেন তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামন্ত সমাজে বা বুর্জোয়া সমাজে মানুষ শ্রম করে বাধ্যতামূলক, জবরদস্তিমূলক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষ শ্রম করে স্বেচ্ছামূলক ও সচেতন শৃঙ্খলায় প্রণোদিত হয়ে। শ্রমের এই স্বেচ্ছামূলক ও সচেতন শৃঙ্খলা সমাজ বিকাশের ইতিহাসে একটা সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা। এর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় মানুষের নতুন মূল্যবোধ ও নতুন সাংস্কৃতিক মান যা বুর্জোয়া সমাজের অর্থলোলুপতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। লেনিনের ভাষায় 'এটা হল একটা বিপ্লবের সূচনা যে বিপ্লব বুর্জোয়াদের উৎপাদন থেকেও অনেক কঠিন, অনেক স্পষ্ট, অনেক মৌলিক এবং সুনিশ্চিত। কারণ এই বিপ্লব রক্ষণশীলতা, বিশৃঙ্খলা এবং পেটি-বুর্জোয়া অহমিকার বিরুদ্ধে বিজয়, বিজয় ঘৃণ্য পুঁজিবাদ কর্তৃক শ্রমিক-কৃষকদের কাছে ফেলে আসা অভ্যাসের বিরুদ্ধে।'[১২]

এই রক্ষণশীলতা, পেটি-বুর্জোয়া অহমিকা এবং পুঁজিবাদী সমাজের কু-অভ্যাস নামিয়ে আনে সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানকে যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মানদণ্ডকে উচ্চে তুলে ধরাই প্রলেতারীয় সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। পেটি-বুর্জোয়া অহমিকা মানুষের সাংস্কৃতিক মানদণ্ডের অবক্ষয়ের নির্দেশক। এই অবক্ষয়ের প্রতিরোধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া প্রলেতারীয় সংগ্রামেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই প্রসঙ্গেই লেনিন আরেক জায়গায় বিপ্লবী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "তুমি আগে দেখাও যে তুমি সমাজের স্বার্থে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে বিনা মজুরিতে শ্রম দিতে সক্ষম, তুমি দেখাও যে তুমি 'বিপ্লবী পদ্ধতিতে কাজ করতে' সক্ষম...।"[১৩] বুর্জোয়া সমাজে মানুষ শুধু নিজের জন্যই কাজ করতে অভ্যস্ত, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রয়োজন শুধু নিজের জন্য কাজ করা নয়, সমাজের জন্যও কাজ করা। এই নৈতিকতা সমাজের স্বার্থকে স্থান দেয় ব্যক্তির স্বার্থের ঊর্ধ্বে।

বিপ্লবোত্তর চীনেও সমাজতন্ত্র গঠনের যে কর্মকাণ্ড চলছে তাতে শহরের শ্রমিকদের ও ছাত্রদের গ্রামের কমিউনে কাজ করা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবীদের ও বিশেষ বিশেষ সময়ে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে একই শ্রমে মিলিত হওয়ার যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে তা বুর্জোয়া সমাজের স্বার্থান্ধতা এবং পেটি-বুর্জোয়া অহমিকার বিরুদ্ধেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম। বুর্জোয়া

সমাজের এই পঙ্কিল অভ্যাসগুলি মানুষের মধ্য থেকে বিদূরিত করতে না পারলে নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গঠন দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বুর্জোয়া কু-অভ্যাসগুলি শ্রমজীবী জনগণকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে নিরন্তর। এর ফলে শ্রমজীবী জনগণের অনেকেই কলুষিত হয়ে পড়ে। রাশিয়ায় এই সমস্যাটা বেশ প্রকট হয়েছিল। ১৯০৫ সালে লেনিনের কাছে লিখিত একটি পত্রে রুশপার্টির একজন স্থানীয় সংগঠক এই ধরনের একটা উদাহরণ দিয়ে লিখছে,

"আমাদের 'সর্বহারারা' যেভাবে চাষবাস করছে তা বেশ অদ্ভুত ধরনের। মিলের একজন তাঁতী তার জমিতে চাষ করবার জন্য একজন মজুর ভাড়া করে। তার স্ত্রী যদি মিলে কাজ না করে তবে সে, তার সন্তানেরা এবং পরিবারের অন্যান্য বৃদ্ধ ও অক্ষম সদস্যরাও ঐ জমিতে কাজ করে। এমন কি সেই শ্রমিকও যখন বৃদ্ধ হবে, অথবা পঙ্গু হবে অথবা হিংসাত্মক বা সন্দেহজনক আচরণের জন্য চাকুরী থেকে বরখাস্ত হবে তখন সেও ঐ জমিতে কাজ করবে। এই-সমস্ত 'সর্বহারাদের' সর্বহারা বলাই চলে না। অর্থনৈতিক অবস্থানে এরা নিঃস্ব, এদের ভাবাদর্শ পেটি-বুর্জোয়া। এরা মূর্খ এবং রক্ষণশীল। এদের মধ্য থেকেই ব্ল্যাক-হাণ্ড্রেড দলে লোক জড়ো করা হয়।"[১৪]

এইগুলি শ্রমজীবী জনগণের উপর বুর্জোয়া সমাজের কদর্যতার প্রভাব। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের উদাহরণের কোন অভাব নেই। শ্রমজীবী জনগণের কলুষিত অংশের মধ্য থেকেই সংগৃহীত হয় শাসকশ্রেণীর ঠেঙাড়ে বাহিনী, যেমন হয়েছিল রাশিয়ায়। এরা শ্রমজীবী জনগণের সন্তান হলেও আদর্শগতভাবে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর প্রভাবাধীন। আবার এমনও দৃষ্টি-গোচর হয় যে, যে শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত কর্মচারী শহরে ট্রেডইউনিয়ন সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করছে, বিপ্লবী সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে, সেই শ্রমিকই আবার তার গ্রামে ফিরে যেয়ে হরিজন নিগ্রহ বা অনুরূপ কোন কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। এইগুলি সাংঘাতিক স্ববিরোধিতা। বুর্জোয়া অপ-সংস্কৃতির প্রভাব, বুর্জোয়া রক্ষণশীলতা ও অহমিকা এইভাবেই শ্রমজীবী জনগণের একাংশকে আদর্শচ্যুত করে।

শ্রমজীবী জনগণের উপর এই অনৈতিক প্রভাব নতুন সমাজ ও নতুন মানুষ গড়ার বিরোধী। শ্রেণীসংগ্রাম, তা কলে-কারখানায়, খেতে-খামারে অর্থনৈতিক সংগ্রামের রূপেই হোক, অথবা পুরোমাত্রায় রাজনৈতিক সংগ্রামের

রূপেই হোক—এই পঙ্কিল ও অমানবিক প্রভাবকে দৃষ্টিগোচরে না এনে সার্থক রূপ লাভ করতে পারে না। রুশ ও চীন বিপ্লব এবং ঐ দুইটি দেশের সমাজতন্ত্র গঠনের কর্মকাণ্ড সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই দায়িত্বটিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করছে।

রুশ বিপ্লবের পর রুশ জনগণের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিনের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। লেনিন লিখেছেন,

'...আমাদের স্বীকার করতে হবে যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীরই একটা মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই মৌলিক পরিবর্তনটা হচ্ছে এই যে, পূর্বে আমরা রাজনৈতিক সংগ্রাম, বিপ্লব ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ইত্যাদির উপরই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকতাম বা দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন সেই গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটছে এবং তা এখন শান্তিপূর্ণ, সাংগঠনিক, 'সাংস্কৃতিক' কর্মকাণ্ডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে..."

'সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমাদের দেশকে পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য যথেষ্ট হবে, কিন্তু এই দায়িত্বের সামনে অবস্থান করছে পুরোপুরি সাংস্কৃতিক ধরনেরই (কারণ আমরা নিরক্ষর) এবং বস্তুগত ধরনের (সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্য উৎপাদনের উপায়ের বেশ কিছুটা বিকাশ ও বস্তুগত ভিত্তি অর্জন প্রয়োজন) বহুবিধ অসুবিধা।'[১৫]

কাজেই রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করার মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণ সমাজতন্ত্র গঠন সম্ভব। রুশ ও চীন বিপ্লবের এটাই মহান শিক্ষা। এখনও সামন্তবাদী ধ্যানধারণায় ভরপুর ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে তাই সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চীন বিপ্লবের অগ্রগতিতে যেমন কনফুসিয়াস-বাদের বিরুদ্ধে লড়াই চীন বিপ্লবের অন্যতম কর্মকাণ্ড ছিল, ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে আন্দোলন যেমন চীনে বিরাট সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করেছিল অনুরূপ দায়িত্ব ভারতের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। একদিকে সামন্তবাদী সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শের প্রভাব, অপরদিকে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অনুপ্রবেশ ভারতীয় সমাজে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি—যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতিরেকে প্রলেতারীয় বিপ্লবে অপূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য। শ্রেণীসংগ্রাম তাই যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম, তেমনি বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবর্দ্ধমান 'মনুষ্যত্বহীনতা'ও তার লক্ষ্য।

১। মার্কস, দি সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স, মার্কস-এঙ্গেলস্ সিলেক্টেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড. পৃঃ ৪৭৪।

২। মার্কস, দি জার্মান ইডিয়লজি, পৃঃ ৬৯।

৩। লেনিন, হোয়াট ইজ টু বি ডান, সিলেক্টেড ওয়ার্কস্, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৪।

৪। লেনিন, কালেক্টড ওয়ার্কস, ৩১তম খণ্ড, পৃঃ ২৮৭।

৫। মার্কস, দি জার্মান ইডিয়লজি, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮।

৬। মার্কস, থিসিস অন ফয়ারবাখ, ঐ, পৃঃ ৫।

৭। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, এ্যান্টি-ড্যুরিং, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

৮। ঐ, পৃঃ ১৪৮-৪৯।

৯। উইলিয়ম শেকস্পীয়র, ওথেলো।

১০। ঐ, মার্চেন্ট অফ ভেনিস।

১১। মার্কস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫।

১২। লেনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ২৯তম. খণ্ড, পৃঃ ৪০৯।

১৩। ঐ, পৃঃ ৪৩১।

১৪। ঐ, নবম খণ্ড., পৃঃ ২৩২।

১৫। ঐ, ৩৩তম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৪-৭৫।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামের প্রশ্ন

বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতির প্রশ্ন নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায় যদি তা কোন বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজব্যবস্থার নিরিখে আলোচিত না হয়। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষায় নন্দনতত্ত্ব ও সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজবিপ্লবের ধারায় কি রূপ পরিগ্রহ করে তা একটি গুরুতর ঐতিহাসিক প্রশ্ন। কারণ মার্ক্সীয় তত্ত্ব কোন অসার ও নৈর্ব্যক্তিক তর্কবিতর্ক মাত্র নয়। তত্ত্ব হিসাবে এ যেমন বৈজ্ঞানিক এর প্রয়োগ পদ্ধতিও তেমনি ইতিহাসসম্মত। তাই ভারতের সমাজবিপ্লবের বর্তমান স্তরে এই প্রশ্নের উপর আলোকপাতের প্রচেষ্টা একটা দুরূহ অথচ ঐতিহাসিকভাবে অতি জরুরী দায়িত্ব।

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা

ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে মিশর, মেসোপটেমিয়া বা গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার একটা বিশেষ ধরনের পার্থক্য বিদ্যমান, তা হচ্ছে ভারতীয় ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারা। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পূর্ববর্তী পর্যায়ে মিশর বা ইরাকের কোন সাধারণ কৃষকের পক্ষে তার পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানসঞ্চয় প্রায় অনেকক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না, কিন্তু একজন অতি সাধারণ ভারতীয়ের কাছেও জানা ছিল আংশিক সত্য ও আংশিক কল্পনায় মিশ্রিত অনেক কাহিনী যেগুলির ইতিহাসকাল ছিল খ্রীষ্ট জন্মেরও প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে। ভারতের গোঁড়া ব্রাহ্মণরা দৈনিক পূজা অর্চনার সময়ে যে স্তোত্র পাঠ করে তারও সৃষ্টি হয়েছিল আরও বেশ কিছু পূর্বে। বস্তুতঃ ভারত ও চীন পৃথিবীতে এই দুইটি দেশ প্রাচীনতম সংস্কৃতির এক অবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের অধিকারী।

শুধু প্রাচীনতম সংস্কৃতির ঐতিহ্যের অবিচ্ছিন্নতাই নয়, ভারতের সভ্যতার আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উৎপাদনের উপায় ও উৎপাদন সম্পর্কের নানান রূপান্তর সত্ত্বেও প্রতিটি যুগের অবশিষ্টাংশের পর্যায়ক্রমিক ভাবে পরবর্তী যুগসমূহে সুস্পষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন-ধারায় প্রবাহমানতা। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বিকাশের ধারায় পূর্বতম ঐতিহাসিক কালের অবশিষ্টাংশের এই ধরনের প্রবাহমানতা

পরিদৃষ্ট হয় না। এটা ভারতের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ও সামাজিক চরিত্রেরই সুস্পষ্ট নির্দেশক। বিবর্তনের ধারা ভারতের জটিল সমাজ জীবনে অতীতের চিহ্নগুলিকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে তা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সংযোজিত করেছে একটা বিশিষ্ট রূপ। ভারতীয় সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনায় এই সত্যকে অস্বীকার করে অগ্রসর হওয়া বাস্তব সম্ভব নয়।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আরেকটি যে অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে তার সীমাহীন বৈচিত্র্য। ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের পার্থক্য থেকে আরম্ভ করে পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্য, জীবন-ধারণের মান ও পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুবিপুল পার্থক্য বিদ্যমান। আব-হাওয়া, জলবায়ু এবং ভৌগলিক গঠন ও পরিবেশেরও রয়েছে আকাশ-পাতাল তারতম্য। আবার এই তারতম্য ভারতীয়দের স্বভাব, মন-মেজাজ ও রুচির ক্ষেত্রেও সৃষ্টি করেছে গুরুতর বৈপরিত্য।

আবার এরই সঙ্গে চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যও ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক জীবনে সৃষ্টি করেছে এক নিদারুণ বৈসাদৃশ্য। একই প্রদেশে, একই জিলায়, এমন কি একই শহরের মধ্যে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিভিন্নতা অনুযায়ী রয়েছে সংস্কৃতিগত পার্থক্য। প্রবল ধনাঢ্য জমিদার পুঁজিপতি যেমন রয়েছে, তেমনি বিপরীতভাবে রয়েছে পুরোপুরি ভুখা-নাঙ্গা হৃতভাগ্য মানুষের দল। একদিকে যেমন রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিশ্ব-বন্দিত প্রতিভাধর ব্যক্তি অপরদিকে তেমনি রয়েছে এমন কি অক্ষর-জ্ঞানের সঙ্গেও সম্পর্করহিত মানুষেরা। আবার একদিকে যেমন ভারতের বুকে সৃষ্টি হয়ে চলেছে আধুনিকতম শিল্প ও প্রযুক্তি-বিদ্যা, তেমনি অপরদিকে সেই শিল্প ও প্রযুক্তি-বিদ্যার পাশাপাশিই খুঁজে পাওয়া যাবে এমন মানুষদের যারা এখনও বিচরণ করছে প্রায় সেই ফল-মূল সংগ্রহকারী আদিম মনুষ্য সমাজের স্তরে।

বর্তমান ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটাই দেখা যাবে যে ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহারে পৃথক হলেও ভারত শাসিত হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বার্থে সুসংবদ্ধ এক শাসকশ্রেণীর দ্বারা—আধুনিক ভাষায় যাদের নামাকরণ হল বুর্জোয়া। এই আধুনিক বুর্জোয়া শাসিত ভারতবর্ষের ভূমিব্যবস্থায় এখনও প্রবলভাবে বিরাজ করছে আধা-সামন্তবাদ। আর শুধু গ্রাম্য সমাজ নয়, শিল্পোন্নত শহরে সমাজেও কব্জা করে আছে সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার ঘোর

অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাব। কাজেই এক অসাধারণ বৈপরিত্য—আধুনিকতা ও আদিমতা—ভারতীয় সমাজকে আজও পর্যন্ত করে রেখেছে বিভক্ত।

অবশ্য পূর্বেই যে কথা বলা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে একমাত্র এই বৈচিত্র্য দিয়েই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায় না—এ ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা যা উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারা।

বৈদিক যুগের প্রভাব

বর্তমানে ভারতের সংস্কৃতির এবং তারই সঙ্গে অপ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উদ্ভাবনাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগের প্রভাব কিছুটা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। আজ পর্যন্ত জানা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার উদ্ভব ঘটেছিল সিন্ধু উপত্যকায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ২০০০ বৎসর পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় যে নগর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল অচিরেই খুব আকস্মিক ভাবে। সেই উন্নত সংস্কৃতির প্রবাহে ছেদ পড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পরবর্তী ভারতীয় সমাজকে পরিচালিত করতে পারে নি। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রবাহমানতায় এই ক্ষেত্রেই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে যে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেছিল তাদের প্রচলিত সভ্যতা ছিল অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্নস্তরের। কিন্তু তা হলেও আর্যদের প্রতিষ্ঠিত বৈদিকসভ্যতার ধারাই নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে ভারতীয় সমাজে এবং আজও পর্যন্ত সেই ধারা অব্যাহত।

সিন্ধু সংস্কৃতির তুলনায় নিম্নস্তরের এই আর্য সংস্কৃতি পৃথিবীর ইতিহাসে যে গুরুত্বলাভ করেছে তার মূল কারণ ছিল আর্যদের অতুলনীয় দ্রুতগামীতা। অশ্ব-চালিত রথের সাহায্যে যুদ্ধ চালিয়ে, ভারবাহী পশু ও গোযানের সাহায্যে খাদ্য ও অন্যান্য সরবরাহ বজায় রেখে যেমন এরা যুদ্ধ জয় করেছিল, তেমনি প্রয়োজন অনুযায়ী বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের কৃত-কৌশলগুলিকে ক্রমাগত আয়ত্ত করে এরা নিজেদের অবিসংবাদী ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই আর্যরা প্রতিষ্ঠিত হবার পর মানুষের সভ্যতা এবং মানুষের ইতিহাস—অন্ততঃ ভারতের ক্ষেত্রে এক নতুন স্তরে যাত্রা শুরু করল। উৎপাদনের তৎকালীন রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেব-দেবী, সমাজ-বিন্যাস, সামাজিক রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণার যে ভিত্তি এরা প্রতিষ্ঠিত করল

পরবর্তী ভারতীয় সমাজকে সেই রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা প্রভাবিত করে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

বৈদিক যুগের মানুষ ভারতের বাইরে থেকে এসেছিল এবং তারা ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্তর্ভুক্ত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার সংস্কৃতি ছিল নগরকেন্দ্রিক এবং সেই নগরগুলি দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। আর্যজাতি ভারতে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের দুর্গগুলি ধ্বংস করে দেয়। এই ঐতিহাসিক ঘটনারই ছায়াপাত হয়েছে ঋগ্বেদে ইন্দ্রের বীরত্বসূচক কীর্তির বর্ণনায়। পাশাপাশি বৈদিক সাহিত্যে আর্যরা যে জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তাদের দস্যু বা দাস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মতের বিভিন্নতা থাকলেও মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এই ঋগ্বেদের রচনাকাল ছিল খৃষ্টপূর্ব ১৪০০-১৫০০ শতাব্দীর মধ্যে।

ঋগ্বেদের যুগে ছিল রাজতন্ত্র, আর অবশ্যাম্ভাবী রূপেই ছিল শ্রেণী-বিভেদ। ঋগ্বেদে রাজার উদ্দেশ্যে রচিত দুটি সূক্ত পাওয়া যায় (১০। ১৭৩ এবং ১০। ১৭৪)। পৃথিবীতে মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাজতন্ত্র ছিল একটি আবশ্যিক পর্যায়, ভারতের ক্ষেত্রে এটা অভিনব কিছু নয়। কিন্তু বৈদিক যুগের যে বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সমাজকে আজও প্রভাবান্বিত করে চলেছে এবং যা আজকের সমাজেও অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও অপসংস্কৃতির সৃষ্টি করে চলেছে তা ছিল বর্ণভেদ। বর্ণ ও আশ্রমকে হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়। এটা অনুমান করা অন্যায় নয় যে বর্ণ ও আশ্রমের বিন্যাস ঋগ্বেদের যুগ হতেই আরম্ভ হয়েছিল। ঋগ্বেদের যুগেই যে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল তার প্রমাণ পুরুষসূক্ত (১০।৯০)। তার দ্বাদশ ঋকে আছে পুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু হতে রাজন্য হল, দুই উরু হতে বৈশ্য হল এবং দুই চরণ হতে শূদ্র হল। সুতরাং ঋগ্বেদে যে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হল, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ঋগ্বেদের অন্যত্র দুটি 'মূল ভাগ পাওয়া যায়—আর্য ও দাস। এটাকে জাতিভিত্তিক বিভাগ ধরে নেওয়া যেতে পারে। অথর্ববেদে অবশ্য দাস অর্থে শূদ্র শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে (৪।২০।৪)।

অর্থনৈতিক ও পেশাগত ভিত্তিতেই রূপ পেয়েছিল এই সমাজবিন্যাস। ব্রাহ্মণ বিদ্যাচর্চা করত বলেই মুখ হতে তার উৎপত্তি; ক্ষত্রিয় শান্তিরক্ষা করত বলে বাহুদ্বয় হতে তার উৎপত্তি; বৈশ্য ছিল ব্যবসায়ী—অর্থনৈতিক বিন্যাসকে সুরক্ষিত করত বলে তার উরুদ্বয় হতে উৎপত্তি; আর শূদ্র ছিল

সকলের নীচে—সেবা করাই তার কাজ ছিল বলে চরণ থেকে তার উৎপত্তি।

ঋগ্বেদের যুগে কৃষিকার্যই ছিল সমাজে অর্থনীতিক বিন্যাসের ভিত্তি। সেকালে কৃষকের বিভিন্ন নাম ছিল। চাষী অর্থে কীনাশ শব্দটির প্রয়োগ আছে (৪।৫৭।৮)। চাষীকে কৃষিবলও বলা হত। কিন্তু উপরোক্ত চতুর্বর্ণ বিভাগ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এই চাষীরাই ছিল বর্ণভেদের সর্বনিম্নে—অর্থাৎ তারাই ছিল শূদ্র।

ভারতীয় সামন্তবাদে জাতিভেদ

আর্যদের যে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও বিনিময়-মূলক ব্যবসা অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যেই এই বর্ণভিত্তিক শ্রেণী কাঠামো সুস্পষ্ট রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। এই শ্রেণী-কাঠামোতে শূদ্র জাতির অস্তিত্ব পরবর্তীকালের ভারতীয় সমাজে এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

এই শূদ্ররা যে উদ্বৃত্ত খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী উৎপাদন করত তাই সমাজের অন্যান্য শ্রেণীগুলির দ্বারা ব্যবহৃত হত। সাধারণ ভাবে পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত সমাজের ন্যায় ভারতেও শোষক ও শোষিত—এই দুইভাগে বিভক্ত শ্রেণী-সমাজের মধ্যেই বৈদিক যুগে আবার উপরোক্ত জাতিভেদ প্রথাও সৃষ্টি হয়েছিল। এই জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজের একটা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য।

আরো যেটা হয়েছিল তা হল ব্রাহ্মণদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তি। বৈদিক যুগের ধর্মগ্রন্থগুলিতে ব্যাপকভাবে যাগ-যজ্ঞাদির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অগ্নি ছাড়াও অন্যান্য বৈদিক ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেও যজ্ঞ করা হত, যদিও প্রতিটি যজ্ঞ অগ্নির সহযোগেই অনুষ্ঠিত হত। অবিরাম এই যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান এবং নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্রাহ্মণদের আর্থিক প্রতিপত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছিল এবং ক্ষত্রিয়দেরও স্থায়ীভাবেই যুদ্ধ-কার্যে লিপ্ত রাখত। একদিকে ব্রাহ্মণকুলের এই শক্তি সঞ্চয় এবং সামাজিক আধিপত্য এবং পাশাপাশি শূদ্রদের উপর অনুষ্ঠিত তীব্রতর শোষণ ভারতীয় সমাজে এক নিদারুণ জাতিভেদ ও জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল—যার কলুষ আজও যথেষ্ট শক্তি নিয়ে বিদ্যমান।

আজকের ভারতে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ এবং সর্বোপরি যে হরিজন সমস্যা সমাজকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে এবং সমাজে বিভিন্ন ধরনের কদর্যতা, অন্যায় কুসংস্কার সৃষ্টি করছে তার মূল ভারতের সুদূর ইতিহাসেই নিহিত।

এ ছাড়া বৈদিক-যুগ পরবর্তীকালেও ভারতে সামন্ততন্ত্র যে ধারায় অগ্রসর হয়েছিল তাতেও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের বহু ক্ষমতাই পুরোহিত সমাজের কুক্ষিগত হয়েছিল। ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণদের যে জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে তাতে বিদ্যাচর্চাই তাদের বৃত্তি বলে ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী স্তরে মৌর্যোত্তর কালে এবং বিশেষ করে গুপ্তদের সময় থেকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোন কোন দিক যখন রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্রের অভিমুখী করে তুলল সেই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ব্রাহ্মণদের ভূমিদান প্রথা। এই প্রথা অবশ্যই ছিল ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী এবং মহাকাব্য ও পুরাণেও এই প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভূমিদানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। আবার মৌর্যোত্তর প্রাচীন পালি গ্রন্থে কোশল এবং মগধ রাজ্যের রাজাগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের গ্রামদানের উল্লেখ আছে। অবশ্য দাতাদের প্রশাসনিক অধিকার বর্জনের কথা তাতে উল্লেখ করা হয় নি। 'খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে এইরূপ ভূমিদানের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে—সেই দুটি এই, জমির খাজনা আদায় এবং প্রশাসনিক ও আরক্ষা (পুলিস) ব্যবস্থার হস্তান্তর।[১]

এইরূপ দানের ফলে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই রাজা ও প্রজাদের মধ্যে একদল শক্তিশালী মধ্যবর্তীর আবির্ভাব হল। 'ভূ-সম্পত্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ক্রমশঃ যেমন বাড়তে থাকল ততই তাদের মধ্যে অনেকে ধীরে ধীরে নিজস্ব পুরোহিত বৃত্তি পরিত্যাগ করে মূল মনোযোগ এবং কর্মশক্তি ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত করতে থাকলেন। ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম অপেক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ ক্রিয়াকর্মই তাঁদের কাছে প্রাধান্য পেতে থাকল। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল সর্বব্যাপ্ত কর্মকুশলতা মৌর্যসাম্রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের এইরূপ ভূমিদান করার ফলে মৌর্যোত্তর এবং গুপ্ত যুগে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হতে থাকল। রাজস্ব আদায়ের কাজ, বাধ্যতামূলক শ্রম আদায়, কৃষি ও খনি সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ আরোপ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি এবং প্রতিরক্ষা যা এ পর্যন্ত রাজ কর্মচারীদের দ্বারা প্রতিপালিত হত, ধাপে ধাপে তা পরিত্যাগ করা শুরু হল। প্রথমতঃ পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে এবং পরে যুদ্ধজীবী সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলি চলে যেতে থাকল।'[২]

এটাই অনুমিত হয় যে পুরোহিতগণ তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করে জমি ভোগ করতেন—বা অন্যভাবে বললে—পুরোহিতগণ ছিলেন তৎকালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নীতি ও প্রথার রক্ষক। ব্রাহ্মণগণ তাঁদের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলির আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কর্মে লিপ্ত রাখতেন।

এইভাবেই ঋগ্বেদে বর্ণিত চতুর্বর্ণে বিভক্ত ভারতীয় সমাজের উচ্চ-বর্ণীয়রা শুধু ধর্মীয় অধিকারই ভোগ করল তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ক্ষমতায়ও তারা প্রতিষ্ঠিত হল। উচ্চ-বর্ণীয়দের এই প্রতিষ্ঠালাভের পাশাপাশি শূদ্রদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাও লক্ষণীয়। এই ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতাদের বেগার আদায়ের অধিকার ছিল। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে বিধান আছে যে কর দেওয়ার পরিবর্তে শ্রমিকশিল্পী মাসে এক দিন রাজার কাজ করে দেবে। কর দানের পরিবর্তে শ্রমদান করাকে হয়ত বেগার বলা যায় না। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বেগার শ্রমিক ও কর্মকারদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। শ্রমিকদের কেবল রাজাকেই নয় যে সমস্ত বণিক রাজার অনুমতি প্রাপ্ত ছিল তাদেরও বেগার দিতে হত। কর্মকার, সূত্রধর, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার ইত্যাদিদের কাছ থেকে বেগার শ্রম আদায় করা হত।

কৌটিল্য বেগারের বিভিন্ন প্রকার কাজের উল্লেখ করেছেন, যেমন ওজন করা, মাপা, পেষা ইত্যাদি। কিন্তু তিনি চাষ করা বা চাষ সম্বন্ধীয় কোন কাজের উল্লেখ করেন নি। চাষের জন্য বেগার দানের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় বাৎস্যায়নের কামসূত্রে। তাঁর উল্লেখ অনুযায়ী রাজার জন্য নয়, বরং গ্রাম প্রধানদের জন্যই জমিচাষে বেগার দিতে হত। কামসূত্রের উল্লেখ অনুসারে কৃষক রমণীদের বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রকার কাজ করতে বাধ্য করা হত—যেমন গ্রাম প্রধানদের গোলায় ধান তোলা, তার বাড়িতে জিনিসপত্র পৌঁছানো বা বাড়ি থেকে জিনিসপত্র অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা, পশম, পাট বা সুতো কাটা ইত্যাদি। এর ফলে 'একদিকে দানগ্রহীতা ও ক্ষেত্র-স্বামীদের অধীনস্থ কৃষকদের অবস্থা দাসের মত হয়ে গেল, অন্যদিকে নতুন নতুন কর আরোপের ফলে স্বাধীন কৃষকদেরও অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকল।'[৩]

মনুর বিধান ছিল—শূদ্রদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে নিযুক্ত করা

চলবে। 'কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য একটি যুগান্তকারী নীতির কথা বলেছেন, তাঁর মতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিকে দাস করা চলে না। পরের ভাষ্য অনুযায়ী এর অর্থ ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিযুক্ত শূদ্র, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য দাসদের রাজা মুক্তি দিতে পারেন।……আবার নারদ ও বৃহস্পতি এই সকল হীন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা করেছেন, যারা স্বাধীন হয়েও নিজেদের ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করে। তা ছাড়া ভারতের ইতিহাসে নারদই প্রথম দাসত্বমুক্তির বিস্তারিত বিধিবিধানের নির্দেশ দিয়েছেন।'[৪]

যাই হোক, কৃষকদেরই শূদ্ররূপে গণ্য করা হত এবং তাদেরই ক্রীতদাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছিল। আবার জমির সীমানা সম্বন্ধীয় কলহে নেতৃত্ব-দানকারী শূদ্রদের জন্য বৃহস্পতি কঠোর শারীরিক শাস্তিরও বিধান দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংঘকেও অধীনস্থ কর্মচারী ও শ্রমিকদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। কর্মকার, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার এবং অন্যান্য শ্রমিকশিল্পীদের কাছ থেকে বেগার আদায় করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়েছিল।

এই সত্য খুবই সুস্পষ্ট যে সামন্ততন্ত্রের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজের এই জাতিভেদ প্রথা রক্ষা পেয়েছে এবং সঞ্জীবিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজে এই জাতিভেদ তাই সামন্তবাদেরই কুফল। একই ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা যে কি মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ভারতের আজকের চিত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জাতিভেদ ও সামন্ততান্ত্রিক বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ভারতে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুঁজি একচেটিয়া পুঁজিতেও রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু তদসত্ত্বেও ভারতে সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ উৎপাটন ঘটে নি। আর সমস্ত কুসংস্কার, কু-আচার, অন্ধ-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনার অন্ধকারময়তার মূল ভিত্তিই হচ্ছে ভূমিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক। ভারতে আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার উপর আরোপিত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ভারতের সমাজ জীবন থেকে সামন্ততান্ত্রিক কুফলগুলিকে বিদূরিত করতে পারেনি। সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার, কু-আচার, জাতিভেদ, অন্ধ-বিশ্বাস ইত্যাদি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবধারাগুলি সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের শুধু পরিপন্থী নয়, এই ভাবধারাগুলি বিভিন্নরূপী অপ-সংস্কৃতির জন্মদাতৃও বটে।

বৃটিশদের ভারত দখলের পর ভারতে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন ঘটলেও

এই কু-সংস্কার ও জাতিভেদের বিন্দুমাত্র অবসান ঘটে নি। রামমোহন-বিদ্যাসাগর যে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তা মূলতঃ ছিল সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁরা কেহই সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারেননি। সামন্তবাদকে জীইয়ে রেখেই এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষ করেই তাঁরা তাঁদের সমাজসংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাই তাদের সংস্কার আন্দোলন ভারতের সমাজ জীবনে অতি তাৎপর্যপূর্ণ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করলেও সমস্যার মূলকে চূর্ণ করতে পারে নি। তা ছাড়া আরো লক্ষণীয় যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখদের সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশ এবং আরও কিছু অঞ্চলে ফলপ্রসূ হলেও ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে অনুরূপ আন্দোলনের অভাবে জাতিভেদ ও কুসংস্কারের ভিত বিন্দুমাত্র দুর্বল হয় নি। রামমোহন সতীদাহের মত বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। এই দুটো সংগ্রামই ছিল সে যুগে দুটি অতি বলিষ্ঠ কর্মকাণ্ড যে বলিষ্ঠতার প্রকৃত স্বরূপ আজকের দিনেও হয়ত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কিন্তু যেহেতু এই বিষক্রিয়ার মূল ভূমি-সম্পর্ক অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র অক্ষুন্ন ছিল তাই সতীদাহ রামমোহনের আন্দোলন ও বেন্টিঙ্কের আইনে নিষিদ্ধ হলেও ভারতের হিন্দুসমাজে বিধবাদের মর্যাদাহীনতা বা বাধ্যতামূলক ক্লেশের কোন অবসান ঘটে নি। অপর পক্ষে বিদ্যাসাগর অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বিধবা বিবাহ আন্দোলন পরিচালনা করলেও এবং নিজ পুত্রকে বিধবার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেও তদানীন্তন কালে দূরে থাক, আজও যেখানে ভারতে একচেটিয়া পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেখানেও বিধবা বিবাহ কোন সহজ সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। এর একটাই কারণ—তা হল সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত নারী সম্পর্কিত যে ধ্যান-ধারণা সমাজকে কলুষিত করে রেখেছে সেই ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে ও মূল ভিতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো হয় নি—বরং তার সঙ্গে আপোষ করা হয়েছে। উপরি কাঠামোর বিরুদ্ধে লড়াই করে আবার পাশাপাশি ভিতের সঙ্গে আপোষ করে উপরি কাঠামোকে দুর্বল করা যায় না। এই সংস্কার আন্দোলনগুলির সর্বস্বীকৃত প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও এখানেই ছিল এইগুলির মূল দুর্বলতা।

পরবর্তীকালে গান্ধীজীই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা জোরালোভাবে জাতিভেদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি শূদ্রদের হরিজন আখ্যা দিয়েছিলেন

এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে যে জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল পরবর্তী পর্যায়ে তা আরো ভীষণ রূপ ধারণ করেছিল। শূদ্রের স্পর্শ করা খাদ্য ভক্ষণ করা বা পানীয় পান করাই শুধু পাপকর্ম নয়, এমন কি শূদ্রের ছায়া মাড়ানোও অশুদ্ধ কর্ম এবং কোন শূদ্রকে তার অপ-রাধের জন্য হত্যা করাও বিধেয়। এইভাবেই এই জাতিভেদের পরিণতি ঘটেছিল। গান্ধীজী এই সমস্যার নির্মমতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু গান্ধী ছিলেন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর শীর্ষ নেতা। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেছিল ভারতের জমিদার শ্রেণীর সঙ্গে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোষ রক্ষা করেই। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি। পরবর্তীকালে দেশ স্বাধীন হবার পরও ভারতের শাসনক্ষমতায় যাঁরা আসীন হলেন তাঁরা হলেন ভারতের বুর্জোয়া এবং জমিদার এই দুই শ্রেণী।

এই প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হল সামন্তবাদী ভূমি সম্পর্ক এবং সামন্তবাদী ধ্যানধারণার সুরক্ষা। তাই গান্ধীজী আজীবন হরিজন সমস্যার বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই চালালেও যেহেতু অস্পৃশ্যতা বা জাতিভেদের মূল ভিত্তটির সঙ্গে তিনি আপোষ করে চলেছিলেন তাই তাঁর আন্দোলন সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে নি। আজকের দশকেও ভারতের সমাজব্যবস্থায় এই সাংঘাতিক ব্যাধির প্রকোপ আদৌ হ্রাস পায় নি। এইগুলি সামন্তবাদী অপসংস্কৃতি। শুধুমাত্র উপরি-কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এই অপ-সংস্কৃতি দূর করা যাবে না—এর জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এর মূল ভিতকে অপসারণ অর্থাৎ ভারতে ভূমিবিপ্লব সম্পন্ন করা—ভূমি সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটানো। এই সম্পর্কে আরেকটি ঘটনারও উল্লেখ করা যেতে পারে। গান্ধী নিজে উচ্চবর্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়েও নিম্নবর্ণের জন্য সংগ্রাম করে-ছিলেন। কিন্তু ডঃ আম্বেদকর নিজেই ছিলেন নিম্নবর্ণভুক্ত এবং তিনি ছিলেন ভারতের নিম্নজাতিদের অবিসংবাদী নেতা। আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন নিম্নজাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই ডঃ আম্বেদ-করের নেতৃত্বেই যখন প্রণীত হল স্বাধীন ভারতের সংবিধান, তখন দেখা গেল ভারতের উচ্চবর্ণের লোকেরা এই সংবিধানের ছত্রছায়ায় থেকেই নির্বিবাদে

নিপীড়ন করে চলেছে নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর। ডঃ আম্বেদকরের প্রণীত সংবিধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার ফলে ভারতের ভূমিতে সামন্তবাদী সম্পর্কও পবিত্রতা লাভ করেছে। তাই ডঃ আম্বেদকর নিজে নিপীড়িত বর্ণভুক্ত মানুষদের অবিসংবাদী নেতা হলেও সামন্তবাদের সঙ্গে আপোষরফা করে তিনি যে সংবিধান প্রণয়ন করলেন সেই সংবিধান জাতিভেদ প্রথা বিলোপ দূরে থাক—নিম্নবর্ণের মানুষদের উপর উচ্চবর্ণের মানুষদের নিপীড়ন আদৌ খর্ব করতে সমর্থ হয় নি। কাজেই ভূমি বিপ্লব ব্যতিরেকে এই সামাজিক ব্যাধি ও তজ্জনিত অপসংস্কৃতির অবসানের কোন পথ খোলা নেই।

সমাজে নারী সম্পর্কে ধ্যানধারণা

এঙ্গেলস্ লিখেছেন, 'মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ নারী জাতির এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, নারী হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র।'[৫] এঙ্গেলস্ একই সঙ্গে আরো বলেছেন 'পুরানো সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালীতে যেখানে বহু দম্পতি ও তাদের সন্তান-সন্ততি থাকত সেখানে গৃহস্থালীর ব্যবস্থা নারীর উপর ন্যস্ত ছিল, যে কাজ পুরুষের খাদ্য আহরণের মতোই সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় বৃত্তি বলে গণ্য হত। পিতৃপ্রধান পরিবার উদ্ভবের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটল এবং একগামী একক পরিবারে তাতে আরও বেগ সঞ্চারিত হল। গৃহস্থালীর কাজকর্মের সামাজিক চরিত্র তখন অপসৃত। এটি আর সমাজ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার রইল না, হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তি। সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃতা স্ত্রী-ই হল প্রথম গৃহদাসী।'[৬]

সমাজে নারী সম্পর্কিত ধ্যানধারণা এবং নর-নারীর যৌনপ্রেমের প্রকৃতির উপর সমাজের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী গুরুতররূপে নির্ভরশীল। এঙ্গেলস্ নারী জাতির যে বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় ও ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন তার উপর ভিত্তি করেই জগতে যে সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে তা নিশ্চিত ভাবেই পুরুষ প্রধান। এই চরিত্র কি পাশ্চাত্য দেশে কি ভারতে সর্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহই এর ব্যতিক্রম।

ভারতের হিন্দুসমাজে নারীর স্থান শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যন্ত অবনমিত অবস্থায় চলে এসেছে। ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থারই

ফলশ্রুতি নারীর অবনমিত অবস্থা। ঋগ্বেদের রাজতন্ত্রে যখন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে আদিম অবস্থাতেই অধিষ্ঠিত ছিল, সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি-সম্পর্ক যখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখন অবশ্য নারীর এতটা অবনমিত অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। বরং পুরুষের সঙ্গে নারীদের অনেকক্ষেত্রে সমানাধিকারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ যুগে যজ্ঞ নিষ্পাদন ছিল ধর্মের বিশিষ্টতম অঙ্গ। বেদের একাধিক সূক্তে নারী ও পুরুষের একসঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পাদনের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের একটি ঋকে বলা হচ্ছে,

'হে ইন্দ্র মর্ত্য হোতা স্তোত্রাভিলাষী দেবতাদের স্তব করে স্ত্রী-পুরুষে যজ্ঞ নিষ্পাদন করছে।'[৭]

এ থেকে অনুমান করা যায় নারী ও পুরুষ একই সঙ্গে যজ্ঞ নিষ্পাদন করতেন। আবার আরেকটি সূক্তে বলা হয়েছে,

'যখন তুমি (অগ্নি) দম্পতিকে একান্তকরণ করে দাও, তখন তারা তোমাকে বন্ধুর মত গব্য দ্বারা সিক্ত করে।'[৮]

পণ্ডিতগণ পত্নীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন যে তিনি পতির সঙ্গে মিলে যজ্ঞ করতেন। এই ব্যাখ্যা করতে তাঁরা পাণিনির একটি সূত্রও উল্লেখ করেন—পত্যুর্ণো যজ্ঞ সংযোগে। এই সূত্র ধরেই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে ঋগ্বেদের যুগে পতি ও পত্নী একসঙ্গে যজ্ঞ করতেন বলেই জায়ার পত্নী নাম।

বৈদিক যুগে পুরুষের একাধিক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যেরও দুই স্ত্রী ছিল—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। আবার নারীরও একাধিক বিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সূর্যের কন্যা সূর্যা অশ্বিদ্বয়কে পতিত্বে বরণ করেছিলেন (৯।১১৯।৫)। ১০।৮৫ সূক্তের প্রারম্ভে সূর্যার বিবাহ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রার বেশ সুন্দর বর্ণনা আছে। তাতে বলা হয়েছে সোম সূর্যাকে বিবাহ করতে উৎসুক ছিলেন, কিন্তু অশ্বিদ্বয়ই তাঁর বররূপে গৃহীত হন (১০।৮৫।৯)। আরও উল্লেখ আছে অশ্বিদ্বয় একটি স্ত্রী নিয়ে একসঙ্গে বাস করেন (৮।২৯।৮)। মহাকাব্যের যুগেও স্ত্রীলোকদের অনুরূপ বহুবিবাহের যে প্রচলন ছিল তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাণ্ডবদের একই পত্নীকে বিবাহ করার কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের যুগে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন থাকতে পারে। একটি ঋকে বলা হয়েছে,

'হে নারী সংসারে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার নিকট শয়ন করছে

যাচ্ছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হয়েছে। চলে এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করে গর্ভাধান করেছিলেন সেই পতির পত্নী হয়ে যা কিছু কর্তব্য ছিল সবই তোমার করা হয়েছে।'

এ থেকে বোঝা যায় স্বামী মারা যাবার পর স্ত্রী তার মৃতদেহের অনুগমন করেছিল। মৃত ব্যক্তির সংকারের পর তার বিধবা পত্নীকে বলা হচ্ছে মৃত পতির প্রতি তার সমস্ত কর্তব্য মৃত্যুর সঙ্গে সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সে সংসারে ফিরে আসুক। আবার দেবরের সাথে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহেরও উল্লেখ পাওয়া যায় ১০।৪০।২ ঋকে: 'যেরূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে।'

পরবর্তী সামন্তযুগের মত বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদা চূড়ান্তরূপে অবনমিত না হলেও নর-নারীর যৌন প্রেম তখনও দানা বেঁধে ওঠে নি। পুরুরবার প্রতি উর্বশীর উক্তি—'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই এক প্রকার' (১০।৯৫।১৫)—এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

এঙ্গেলস্ বলেছেন মধ্যযুগের পূর্ববর্তী কালে ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের কোন প্রশ্নই ছিল না। এটা অনস্বীকার্য যে, দৈহিক সৌন্দর্য, ঘনিষ্ঠতা এবং সমধর্মীতাই নর-নারীর মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সেই যৌন আকাঙ্খা আর যৌন প্রেম সমার্থক নয়। প্রাচীন যুগে দাম্পত্য প্রেম পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হত না, বরং তা ছিল একটা বিষয়গত কর্তব্য। এই প্রেম বিবাহের ভিত্তি ছিল না, ছিল বিবাহের পরিপূরক।

মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সম্পূর্ণতঃ পুরুষাধীন হয়ে যাওয়ার পর নর-নারীর পরস্পরের প্রতি স্বতোৎসারিত প্রেম আরো সুদূর পরাহত হয়। যেমন অন্যান্য সমাজে তেমনি ভারতীয় সমাজে নারী দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং একমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় নিদারুণভাবেই ভয়াবহ। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বিধবাদের উপর নির্যাতন, বিবাহিত স্ত্রীদের উপর স্বামী ও স্বামীকুলের অমানুষিক নির্যাতন, পণ-প্রথা, পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার—ইত্যাদি বিবিধ বিষময় ফল ভারতীয় সমাজে প্রকট হয়ে ওঠে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ভারতের সমাজ জীবনে যে অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছিল এবং সারা উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপী যার তীব্রতা অনুভূত হয়েছিল

তার প্রভাব ভারতের কি হিন্দু সমাজে, কি মুসলিম সমাজে সর্বক্ষেত্রে এক সাংঘাতিক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। বিংশ শতাব্দীতেও সেই প্রভাবের অবসান ঘটে নি। এই ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার সর্বাপেক্ষা উৎকট প্রকাশ ঘটে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মধ্য দিয়েই।

মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক চিন্তার অন্ধকারাচ্ছন্নতা, সম্পত্তিতে পুরুষের একাধিপত্য এবং প্রেম বর্জিত বিবাহ প্রথাই ভারতীয় সমাজে নারীর এই মর্যাদাহীনতা ও নিপীড়ন ভোগের মূল কারণ। ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের বিকাশ পুরুষাধিপত্যের নমনীয়তা এবং নারীকে অধিকতর স্বাধীনতা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। কিন্তু বিশেষ করে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে পুরুষাধিপত্যমূলক ভারতীয় সমাজে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত থেকেছে তাতে আধুনিক ব্যক্তিগত যৌন প্রেমের স্বচ্ছন্দ বিকাশ সম্ভবপর ছিল না। ফলে নারী হীনতর পর্যায়ে এক চরম বিড়ম্বনাপূর্ণ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। তা ছাড়া পুরুষের বহু পত্নীত্বের অধিকারের মধ্যেও নিহিত ছিল নারীর মর্যাদাহীনতা। তৎকালীন ইউরোপীয় বিবাহ পদ্ধতি সম্পর্কে এঙ্গেলসের মন্তব্য এক্ষেত্রে স্মর্তব্য,

'আমাদের যুগে বুর্জোয়া বিবাহ প্রথা দুই রকমের। ক্যাথলিক দেশসমূহে আগের মতোই মাতাপিতা তরুণ বুর্জোয়া দুলালের জন্য উপযোগী পাত্রী যোগাড় করে দেন এবং এর ফলে স্বভাবতই একগামিতার স্ববিরোধ পরিপূর্ণভাবেই প্রকটিত হয়; স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে অবাধ হেটায়ারিজম এবং ঢালাও ব্যভিচার চর্চা চালায়। ক্যাথলিক গির্জায় বিবাহবিচ্ছেদ নিশ্চয়ই এজন্য নিষিদ্ধ, কারণ তাঁরা জানেন মৃত্যুর মত ব্যভিচারও এক নিদানহীন নিয়তি। পক্ষান্তরে প্রোটেস্টান্ট দেশগুলিতে সাধারণত বুর্জোয়া ঘরের দুলালকে স্বশ্রেণী থেকে কমবেশী স্বাধীনভাবে স্ত্রী নির্বাচন করতে দেওয়া হয়; ফলত বিবাহের ভিত্তিতে কিছুটা ভালবাসার অবকাশ থাকে এবং শালীনতার জন্য প্রোটেস্টান্ট সুলভ ভণ্ডামীবশে ভালবাসার অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে পুরুষের হেটায়ারিজম-আসক্তি অনেক কম এবং নারীর ব্যভিচারও সহজলভ্য নয়। কিন্তু যেহেতু উক্ত প্রত্যেক ধরনের বিবাহেই নারী পুরুষের বিবাহ-পূর্ব জীবনধারাই অটুট থাকে এবং যেহেতু প্রোটেস্টান্ট দেশসমূহে বুর্জোয়াদের অধিকাংশই বিষয়াসক্ত, তাই প্রোটেস্টান্টদের একগামিতার উত্তম দৃষ্টান্তগুলির

গড়পড়তা হিসাব ধরলেও দাম্পত্যজীবন সেখানে নিরেট একঘেয়েমি মাত্র, অ.র তাকেই বলা হয় দাম্পত্য সুখ'।[১০]

এই মন্তব্য অবশ্যই ভারতীয় বিবাহপদ্ধতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। একগামী পরিবারের রূপ থেকেই যৌন প্রেমের বিকাশ সম্ভব, তবু এমন ধারণা সঙ্গত নয় যে প্রেম কেবলমাত্র বিবাহে অথবা স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা হিসাবেই বিকশিত হয়। বিবাহে মাতাপিতার ব্যবস্থাকৃত পদ্ধতি একটা সুবিধাজনক ব্যাপার মাত্র। এই বিবাহে প্রেমের স্থান বাস্তবে বিবাহের পরিপূরক হিসাবেই পরিগণিত। যৌন প্রেমের প্রথম যে রূপ ইতিহাসে আসক্তিরূপে আবির্ভূত, যে আবেগে সকলেরই সমানাধিকার, যা যৌনাবেগের সর্বোচ্চরূপ, মধ্যযুগীয় শিভালরি-প্রণয়ই বলা যেতে পারে সেই বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত প্রথম যৌন প্রেমের অভিব্যক্তি। এই যৌন প্রেম বুর্জোয়া সমাজে প্রচলিত দাম্পত্য প্রেম থেকে একেবারেই আলাদা।

এঙ্গেলস্ তাই শোষণভিত্তিক সমাজের প্রচলিত বিবাহপদ্ধতির অন্তর্নিহিত কুরুচি ও অনৈতিকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তীব্র মন্তব্য করেছেন,

'পূর্বোক্ত দুটি ক্ষেত্রেই এই রকম বিবাহ প্রায়ই অত্যন্ত স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয়—কখনও দু' পক্ষেই, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর পক্ষে; স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এটুকু যে, সে ভাড়াটে মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না পরন্তু সে দেহটি বিক্রি করে চিরদাসত্বে।'[১১]

মানবসংস্কৃতি বিকাশে নর-নারীর প্রেমের তাৎপর্য এই যে, আধুনিক অর্থে প্রেমের যে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত তা মানবেতিহাসের সামগ্রিক বিকাশেরই ফলশ্রুতি। যৌনাকর্ষণ ও যৌন প্রেম সমার্থক নয়। পরস্পরের প্রতি গভীর অনুভূতি, আবেগ, সহানুভূতি ও মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে যে যৌন প্রেম বিকশিত তা মানবজাতির একটা উচ্চতম আত্মিক কর্মকাণ্ড। মানবের সাংস্কৃতিক বিকাশে এর তাৎপর্য অপরিসীম। রেনাসাঁর নারী প্রকৃত প্রেমের অর্থ অনুভব করেছিল, যে প্রেম পারস্পরিক দায়িত্বপালন, সমানাধিকার, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও আত্মসম্মানবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। শেকস্‌পীয়রের 'রোমিও ও জুলিয়েট' নাটকের মধ্যে এই রেনাসাঁ প্রেম সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। 'রোমিও ও জুলিয়েট' নাটকে নায়ক-নায়িকার বক্তব্য ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র পরস্পরের প্রতি গভীর ভালবাসাই ব্যক্ত হয়েছে তাই নয়, প্রেম একটা সর্বজয়ী, স্পর্ধিত এবং সর্বোচ্চ আত্মিক অনুভূতি

হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এঙ্গেলস্ সঠিকভাবেই বলেছেন আধুনিক অর্থে প্রেমের রয়েছে একটা নতুন নৈতিক মানদণ্ড। এই নৈতিক মানদণ্ডের বাইরে প্রেমের প্রবল নৈতিক তাৎপর্যই হারিয়ে যায়।

রেনাসাঁ যুগের প্রেমের এই উচ্চতর বিকাশ, তার সৌন্দর্য ও মহিমা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পাকা পোক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই হারিয়ে যেতে শুরু করে।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিবেচ্য। সমাজশাসনের দিক থেকে ভারতের হিন্দুসমাজের গঠন বর্ণাশ্রমমূলক—এর শাসন-পালন ব্যবস্থা চতুবর্ণে বিধৃত। বর্ণবহির্ভূত গোষ্ঠীদের সমাজে স্থান ও অধিকার নেই। সমস্ত নারীজাতিই এই সমাজে প্রায় অধিকারহীন। তা ছাড়া ভাবগত ধ্যানধারণায় ভারতীয় সমাজ ধর্মের প্রধান কথা—পুনর্জন্ম ও কর্মবাদ। এক জন্মের ফল শুধু আরেক জন্মে বর্তায় তাই নয়; জন্ম জন্মান্তরেও বর্তায়। এই জন্মে তার বিহিত কর্তব্য সমাজ নির্দিষ্ট; তা পালন করেই কর্মক্ষয় করতে হবে এবং নতুন জন্মের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। জন্মগত এই স্তর বা অবস্থা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা শুধু পাপ নয়, নিজের ভবিষ্যৎ জন্মেরও সর্বনাশ করা। তাই সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলেও সতীদাহের বিকল্প বিধবাদের আমরণ 'ব্রহ্মচর্য' আজও বিদ্যমান। একে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা আজও এমন কি শিক্ষিত হিন্দুসমাজেও পাপ বলে বিবেচ্য। এটা অবশ্য ঠিক যে মুসলমান ধর্ম বা খৃষ্টান ধর্ম ভারতীয় মুসলমান ও খৃষ্টানদের এ শিক্ষা দেয় নি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী তাদের আইনকানুনে পার্থক্য আছে। কিন্তু নারীদের সম্পর্কে অমর্যাদামূলক মনোভাবের ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের ন্যায় মুসলমান সমাজও দায়ী। আবার ইসলামী অনুশাসন বলে যা প্রচার করা হয় তাতে মুসলমান সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদা হিন্দু সমাজের তুলনায় অধিকতর শোচনীয়।

ভারতের ন্যায় চীনদেশেও কনফুসীয় সামাজিক ও পারিবারিক অনুশাসন জাতিভেদ ও সামাজিক অসাম্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কনফুসিয়াস সমাজকে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্রাট, ভূস্বামী ইত্যাদি এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতা, স্বামী ইত্যাদির শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং পাশাপাশি যথাক্রমে মন্ত্রীবর্গ এবং পুত্রকন্যা ও স্ত্রীদের অপকৃষ্টের

আসনে নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ নর-নারীর ক্ষেত্রে স্বামী উচ্চতর এবং স্ত্রী নিম্নতর—এটাই ছিল কনফুসীয় অনুশাসন।

বিগত কয়েক শতাব্দী যাবতই চীনা নারীরা এই অধঃপতিত জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র 'সাহায্যকারী স্ত্রী ও বুদ্ধিমতী মাতা' হিসাবেই তারা পরিগণিত হত। আবার একদিকে যেমন শৈশব থেকেই পা বেধে দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করে চীনা নারীকে দৈহিক ভাবে দুর্বল করে ফেলা হত, অপর দিকে পুরুষদের জন্য বহু বিবাহ আইনসিদ্ধ করে এবং দৈহিক শুচিতা কেবল মাত্র নারীদের ক্ষেত্রেই একতরফাভাবে প্রয়োগ ক'রে নারীদের এক অমর্যাদাকর জীবনযাপনেই বাধ্য করা হত।

প্রকৃতপক্ষে চীন বিপ্লবের ইতিহাসে নারীদের এই অমর্যাদাকর জীবন থেকে মুক্তির আন্দোলন একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কুৎসিত দেশাচার, ও বিকারগ্রস্ত সামাজিক আচার-বিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চীনে বিপ্লবী সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে। সামাজিক কুসংস্কার ও বিকৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সমাজ বিকাশের আন্দোলনের সূচনা ঘটে ১৯১৯ সালে চীনের বিখ্যাত ৪ঠা মের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। প্রচলিত সামাজিক আচার-আচরণ, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদির পুনর্মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'নারীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হল। নারীরা প্রচলিত নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করতে শুরু করল। এই আন্দোলন নারীদের ভোটাধিকারের আন্দোলনকে আরও সক্রিয় করে তুলল এবং নারীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। বাস্তবিক পক্ষে, এই আন্দোলন একটা পারিবারিক বিপ্লবের সূচনা করল এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে চলল।'[১২]

ভারতের ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও উচ্চতম মানবিকতা বোধের আন্দোলন শুরু করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তৎকালীন সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে—তাকে আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আরও সমৃদ্ধ, সর্বাঙ্গীন ও বিকশিত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারীর প্রশ্নে ভারতীয় সমাজের

কুৎসিত দেশাচার, বিকৃত রুচি ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে সুস্থ, সুন্দর ও উচ্চতম মানবিকতাবোধ মণ্ডিত সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব।

সুবিধাজনক পরিস্থিতিটা এই যে বৃহৎ শিল্প এবং পাশাপাশি ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সংকট নারীকে গৃহকোণ থেকে উৎখাত করে শ্রমের বাজারে যেতে বাধ্য করেছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে পুরুষাধিপত্যের ভিত্তি। যদিও একগামী বিবাহের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও নারীর প্রতি আচরিত দৃঢ়মূল রূঢ়তার অবশেষ এবং সামাজিক এবং এমন কি ট্রেডইউনিয়ন কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও নারীর প্রতি অপকৃষ্টতার মনোভাব তীব্রভাবেই বিদ্যমান।

নৈতিকতা ও সৌন্দর্যবোধ বিকাশের ক্ষেত্রে নর-নারীর প্রেম এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। গভীর অনুভূতি, তীব্র অতিরাগ, সমধর্মিতা এবং দৈহিক ও আত্মিক আকর্ষণের মধ্য দিয়ে যে প্রেমের বিকাশ তাই সৌন্দর্য ও উচ্চতম মানবিক মূল্যবোধের মূর্ত রূপ। আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষয় ও অনৈতিকতা এই মূল্যবোধেরই মূলে করছে কুঠারাঘাত। বুর্জোয়া সমাজে পূর্বরাগও সুস্থ দাম্পত্যজীবনের কোন নিশ্চয়তা দান করে না। এঙ্গেলসের ভাষায় বুর্জোয়া সমাজে, 'দশটির মধ্যে নয়টি ক্ষেত্রেই স্থায়ী পূর্বরাগ কার্যত দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাস হানির একটা প্রস্তুতিমূলক পাঠে পর্যবসিত হয়।'[১৩] তাই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সমাজের শোচনীয় বিপথগামিতা, যার ফলশ্রুতি—সামাজিক আচার-আচরণে এবং নর-নারীর সম্পর্কে কদর্যতা ও বিকৃতি। অপ-সংস্কৃতির এই কলুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তাই পূর্বসর্ত নারীর প্রতি মর্যাদাশীল মনোভাব, নর-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক মহত্তম মানবিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা, এবং পারিবারিক গণ্ডীতে স্বামী 'বুর্জোয়া' আর স্ত্রী 'প্রলেতারিয়েত'—এই আধিপত্যমূলক ভাবাদর্শের অবসান এবং সঙ্গে সঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর প্রতি অপকৃষ্টতার মনোভাবের বিলুপ্তি। ধনতান্ত্রিক সমাজে অর্থের ক্ষমতা একদিকে যেমন জগন্নাথের রথচক্রের মত যা কিছু খাঁটি, মহৎ ও সুন্দর—তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রতিনিয়তই জন্ম দিয়ে চলেছে যা কিছু কদর্য ও হানিকর তাকেই। 'সামাজিক উৎপাদনে সমগ্র নারীজাতির পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যে নারীমুক্তির প্রথম শর্ত' এবং নারীমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নর-নারীর সম্পর্কের

ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের বিকাশ সাধন সম্ভব এই সত্য অনস্বীকার্য। ভারতীয় সমাজেও এর কোন ব্যত্যয় নেই।

ধর্মীয় চেতনা ও সাংস্কৃতিক সংঘাত

মানুষ তার সচেতন আকাঙ্খা অনুযায়ী তার নিজস্ব লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কোন সমাজভুক্ত মানুষদের এই বিভিন্নমুখীন এষণা ও কর্মকাণ্ড এবং বহির্জগতে তার বিভিন্নধরনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় ইতিহাস। তাই মানুষই সৃষ্টি করে ইতিহাস, সেই ইতিহাসের রূপ যাই হোক না কেন।

বৃটিশের ভারত দখলের পূর্বে ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঘনিষ্ঠতার বহু উল্লেখ পাওয়া যায় পুরাতন পুথি পত্রে। দেশের ভিতরে লৌকিক প্রভাবে, হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতি সমন্বয়ে কাজটা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল বলে জানা যায়। বাংলায় নবাব পরিবারে হিন্দু আচার অনুষ্ঠান যেভাবে প্রবেশ লাভ করেছিল তা থেকে এই সমন্বয়ের ব্যাপারটা অনেকখানি উপলব্ধি করা যায়। মতিঝিল প্রাসাদে শাহ্‌মত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজউদ্‌দৌলা সানন্দে হোলি উৎসব পালন করেছিলেন বলে কথিত আছে। জানা যায় মীরজাফরও হোলিতে অংশগ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কীর্তীশ্বরীর পাদোদক পান করতে সঙ্কোচ করেন নি। মুবারকউদ্‌দৌলা সাড়ম্বরে ভেলা ভাসান পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন এবং আরো কয়েকটি অনৈসলামিক অনুষ্ঠানের মতো এটিও অভিজাত মুসলমানদের খুব প্রিয় ছিল।[১৪]

অবশ্য কেবল নবাবী আমলে নয়, তার বহু আগে থেকেই এই কাজ শুরু হয়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এই সামাজিক যোগাযোগ ছিল আরো ঘনিষ্ঠ। ফলে, মুসলমানদের মধ্যে দেবীপূজা, পীরপূজা, তাবিজের ব্যবহার, জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোরাণ শরীফ খুলে দেখার প্রথা, ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস, হোলি ও দেওয়ালীর মত উৎসবে যোগদান এবং এমন কি মুসলমান ফকিরদের সর্বদেহ ভস্মাচ্ছাদিত করার রীতিও দেখা যায়।[১৫]

তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ, বিশেষ করে মুসলমানদের হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ, মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের ফলে সমাজের সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ

মুসলমানদের মধ্যে একটা সামাজিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল এবং বিশেষ করে হিন্দু লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনের উৎস আল-কোরান এবং হজরত মহম্মদ ও প্রথম চার খলিফার জীবনদৃষ্টান্ত ইত্যাদি হলেও তার উপলব্ধি এবং ব্যবহারের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই এবং থাকলেও সে পার্থক্য যে গুরুত্বহীন এ কথা বলা চলে না, উপরন্তু এই পার্থক্যই রচনা করে বিভিন্ন এলাকার একই ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় আবেগানুভূতির ভিত্তিভূমি। তাই একজন পাঠান মুসলমানের কাছে ইসলামের যে অর্থ একজন গ্রাম্য বাঙালী মুসলমানের কাছে ধর্মের সেই একই অর্থ এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। ঠিক সেই জন্যই পূর্ববাঙলার যে মুরশেদী মারাবতী গান বাঙালী গ্রাম্য মুসলমানদের অন্তরকে নাড়া দেয় সেই সকল গানের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ আছে যেগুলি বিশুদ্ধ কোরানীয় ধর্মতত্ত্বের বহির্ভূত এবং অনেক সময় তার বিরোধী। বাংলার মুসলনমানদের ধর্মীয় ধারণা এবং সামাজিক রীতিনীতির অনেক কিছুই হিন্দু পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা প্রভাবিত। তাই 'ভারতীয় হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভারতীয় মুসলমানদের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের ধারণাকে প্রামাণ্যভাবে অলীক কল্পনা বলেই মনে হয়।'[১৬] কিন্তু এই অলীক কল্পনাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এত প্রতাপশালী হল কি করে দেশের সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশের স্বার্থে তার সঠিক বিশ্লেষণ নিতান্তভাবেই প্রয়োজন।

অবশ্য এ কথা প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে যে হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক জীবনে উপরোক্ত পারস্পরিক প্রভাবগুলির বিদ্যমানতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে আদর্শগত কোন সমন্বয় সাধিত হয় নি। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায় ভারতে মুসলমান আধিপত্যের পর থেকে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই সমাজ পরস্পরের নিকটতর হবার যে চেষ্টা করেছিল তা ছিল প্রধানত বাস্তব অবস্থার বিবেচনা-প্রসূত। আকবর থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব পর্যন্ত পরস্পরের এই বাস্তব উপলব্ধিরই উদাহরণ দেখা গেছে যে মুসলমানরাও মনে করতেন যে হিন্দুদের সঙ্গে একটা মীমাংসা করেই বাস করতে হবে, আবার হিন্দুরাও বুঝে নিয়েছিলেন যে তাদের মুসলমান শাসকদের হিন্দুত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত করা যাবে না। ধর্ম সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা আকবর করেছিলেন তারও সাফল্য ছিল খুব সামান্যই।

কবীর, নানক প্রমুখদের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আসল কথা এই দুই সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধেরই ফারাকের দরুন এই দুই সমাজ কখনই পরস্পরের সঙ্গে একীভূত হতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যা ছিল মূল্যবান তা হল সামাজিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত কতকগুলি পারস্পরিক প্রভাবের পাশাপাশি পরস্পরের মোটামুটি মিলেমিশে থাকার একটা বাস্তব তাগিদ।

কিন্তু বৃটিশের পদানত ভারতে আধুনিক কালে যে জাতীয় চেতনা বা রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটল তা কিছুদূর অগ্রসর হবার পর অবশেষে ধর্মীয় ভাবধারা অবলম্বন করেই প্রবাহিত হল। বৃটিশদের ভারত জয়ের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানদের যে বাস্তবধর্মী ঐক্য ছিল বা সামাজিক ক্ষেত্রে যে পারস্পরিক প্রভাব ছিল তা পারস্পরিক ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারমণ্ডিত হলেও, বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে জাতীয় চেতনা বিকাশের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানরা সেই ঐক্য ও সামাজিক আদান প্রদান থেকে যেন অনেক দূরে সরে যেতে লাগল। হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের যে সামাজিক আচার-আচরণগুলি আয়ত্ত করেছিল বা গ্রহণ করেছিল যদিও সেইগুলির চরিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুসংস্কারমূলকই ছিল, তবুও সেইগুলিকে তারা পরিত্যাগ ক'রে ঐতিহ্যগতভাবে আরও পৃথক হয়ে যেতে শুরু করল। একদিকে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ এবং অপরদিকে মুসলমানদের ক্রমাগতই যা কিছু ভারতীয় তাকেই অস্বীকার করা এবং পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম সমাজের সমস্ত আদর্শকে আপন করে নেবার চেষ্টা পরস্পরকে বহুদূরে নিক্ষেপ করল। জঙ্গী জাতীয়তাবাদ আর দুর্দমনীয় হিন্দুবাদ সমার্থক হয়ে দাঁড়াল। চরমপন্থী দলগুলি হিন্দু দল হিসাবে গড়ে উঠল। চরমপন্থী নেতারা হিন্দু ঐতিহ্যের গর্বে গর্বিত হলেন। বাংলায় এর প্রকাশ ঘটল প্রবলভাবে। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা', ১৮৭৩ সালে 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' রাজনারায়ণ, নবগোপাল মিত্র এবং ঠাকুর বাড়ীর দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখদের উদ্যোগে 'হিন্দু মেলার' প্রচলন জাতীয় চেতনার সঙ্গে হিন্দুত্বকে একাকার করে দিল। এই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চেতনা বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের রচনায়, আবার সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠল দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়ে। আবার মহারাষ্ট্রে অনুরূপ-

ভাবে গোখেল, তিলক প্রমুখরা যে জাতীয়তাবাদ প্রচার করতেন তাও ছিল হিন্দুত্বের অনুসারী। গণপতি উৎসব, শিবাজী উৎসব ইত্যাদির মাধ্যমে তিলক যে জাতীয়তা বিকাশের চেষ্টা করেছিলেন তা ছিল নেহাতই হিন্দু জাতীয়তা। এই ধর্মকেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও উচ্চমন্যতাকেই সকলে মনে করতেন জাতীয়তাবাদী চেতনা বলে। যে কোন দেশে জাতীয়তাবাদ উত্থানের সময় জাতির অতীত গৌরব এবং ঐতিহ্যের চেতনা জাতীয়তাবাদী মনোভাবে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই সত্য খুবই প্রকট হয়ে উঠল ; আর তাই বুদ্ধ, অশোক, শিবাজী, বেদ-বেদান্ত, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, গঙ্গা, যমুনা সব কিছুই একই ধারায় সম্মিলিত হয়ে জাতীয়তাবাদ হিন্দুত্বের জারক রসে আপাদমস্তক পরিসিক্ত হয়ে গেল।

ঠিক এরই বিপরীতভাবে ভারতের মুসলমানরা অগ্রসর হল সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর খাতে। হিন্দুরা যেমন বিশুদ্ধ ভারতীয় সব কিছুকে গ্রহণ করল তাদের জাতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হিসাবে, তেমনি মুসলমানেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিশেষত বর্তমান শতকে যা কিছু বিশুদ্ধ ভারতীয় তাকেই মনে করল ইসলাম বিরোধী এবং মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী। স্যার সৈয়দের আলীগড় আন্দোলন এ ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের পাল্টা হিসাবে উপস্থিত হল। আলীগড় আন্দোলন মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের উপর ভিত্তি করে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। এই আন্দোলনের পিছনে যাঁরা ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচার ও পাশ্চাত্য মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রেরণা অপেক্ষা তাঁদের কাছে মুসলিম স্বাজাত্যাভিমান প্রতিষ্ঠাই অধিকতর অভিপ্রেত ছিল। 'সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দিক থেকে এর পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা পদ্ধতি বা পাশ্চাত্য চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। বস্তুতঃ এই ঘটনাগুলি মুসলমানদের অতীতের গর্বকে গভীরতর করেছিল এবং ভারতের একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় সামাজিক গোষ্ঠী হিসাবে মুসলমানদের চেতনাকে প্রখরতর করেছিল।'[১৭]

খিলাফত আন্দোলনের সূচনা থেকে অবশ্য হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় এবং তা হয়েছিল উভয় সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক মিলনের এই প্রচেষ্টা নিতান্তই ছিল কৃত্রিম-রূপ-সম্পন্ন। এই প্রচেষ্টা সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয় নি। বরং দেখা গেল উভয় সমাজ

পুনর্জাগরণবাদের ভিত্তিতে পরস্পর থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগল। খৃষ্টীয় ধর্ম এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির আগ্রাসী প্রভাবের বিরুদ্ধে হিন্দুরা যেমন অধিকতরভাবে বেদ, উপনিষদ ও গীতায় আশ্রয় গ্রহণ করল, তেমনি মুসলমানরা কোরান এবং ইসলামের অতীত ইতিহাসের গহ্বরে আশ্রয় সন্ধান করল। তারপর মুসলীম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্ব রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পাকাপোক্তভাবেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলল।

এই শোচনীয় পরিস্থিতির চিত্রটা একজন প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ তুলে ধরেছেন অত্যন্ত মর্মগ্রাহী ভাষায়,

'জাতীয়তা ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হওয়ায় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টি অনুসরণ করল ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পথ। এ পথ ধরে তারা ভারতবর্ষের শ্যামল সমতল, বনভূমি, গিরিদরী, উপত্যকা পরিত্যাগ করে উপস্থিত হলেন আরবের দুস্তর মরুভূমিতে; মিশর, ইরান, তুর্কীর নদ-নদী পাহাড়খন্দতে। ভারতীয় প্রকৃতি পর্যন্ত ভারতীয় মুসলমানদের কাছে এজন্য হোল দোষদুষ্ট। কাব্যসাহিত্যে তাই ভারতবর্ষের থেকে মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক পরিবেশই তাদের হাতে পেল অধিকতর প্রাধান্য। এ মনোবৃত্তির ফলে ভারতীয় মুসলমানদের কাছে বকুল, জবা ও শিউলীফুল এবং গঙ্গা, যমুনা, ভাগিরথী হল বিজাতীয়। অজন্তা, ইলোরা, কোনারক হল বিশুদ্ধ ইসলামী সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন হলেন হিন্দু সংস্কৃতির প্রচারক। আকবর শাহ হলেন জাতীয়তাবাদী মুসলমান এবং মাহমুদ গজনী, আলমগীর, আওরঙ্গজেব হলেন মুসলীম লীগার। ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের এ বিকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে হলে ভারতীয় জীবনের মহাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সেটা করা চলে না। এর সত্যকার পরিচয়ও তাই পাওয়া যাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাম্প্রদায়িকতার রূপান্তরে।

'যা কিছু বিশুদ্ধ ভারতীয় হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেটাই রচনা করল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার আবেগ অনুভূতির ভিত্তি। অন্য দিকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যা কিছু বিশুদ্ধ ভারতীয় সেটাই হল বর্জনীয় পরিত্যাজ্য। সামগ্রিক ভারতীয় জীবনের এই সঙ্কটমুহূর্তে ধর্ম ধর্মীয় কারণে নয়, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং

সমাজতাত্ত্বিক কারণেই সাধারণ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের চেতনা ও শুভবুদ্ধিকে করল আচ্ছন্ন, অভিভূত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত।'[১৮]

ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হল তার বহিরাবরণ ধর্ম হলেও বাস্তবে তা আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল দ্বন্দ্বের ভিত্তিতেই পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। আর এই সুযোগ গ্রহণ করল সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। তাদের ভেদনীতি ও সাম্প্রদায়িক উস্কানী অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করল। একই দেশে বাস করে উভয় সম্প্রদায় এক উন্মত্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হল যার পরিণতি ঘটল ভারত বিভাগে। কিন্তু পরিণতি সেখানেই থেমে থাকল না। দেশ বিভাগ সত্ত্বেও যেহেতু উপমহাদেশের দুই অংশেই (বর্তমানে তিন অংশ) দুই সম্প্রদায়ই পুনরায় পাশাপাশি থেকে গেল তাই ভারত বিভাগের পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়িক কলুষ এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের রেষ বিভক্ত উপমহাদেশেও বজায় রইল।

আসলে ইংরেজদের নীতি ও ইংরেজী শিক্ষা এই ধর্মীয় গোঁড়ামি বা সাম্প্রদায়িকতাকে বিনষ্ট করা দূরে থাকুক, ইংরেজদের সমগ্র শিক্ষানীতি ও শাসনতান্ত্রিক নীতিই এই সাম্প্রদায়িক কলুষের উৎসাহবর্দ্ধক হিসাবে কাজ করেছিল। এই বিষয়ে হাণ্টার সাহেবের উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

'এভাবে মুসলমান যুবকদের আমরা আমাদের নিজস্ব পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এবং ধর্মশিক্ষার বিষয়ে সামান্যতম হস্তক্ষেপ না করেই আমরা তাদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি যাতে করে তারা ধর্মীয় শিক্ষালাভ করলেও ধর্মান্ধ হবে না। বিশ্বের অন্যতম চরম গোঁড়া সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা যেভাবে সহনশীলতার শিক্ষা পেয়েছে, মুসলমানদেরও সেই পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত করা যেতে পারে। অনুরূপ সহনশীলতা মুসলমানদের তাদের পূর্বপুরুষদের গোঁড়ামী থেকে মুক্ত করে আনবে, যে গোঁড়ামী তাদেরকে নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা ও অপরাধজনক কাজের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। আর এ সবই তারা করে এসেছে ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে। কোন পদ্ধতির প্রবর্তনের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানদের সমভাবে উচ্চতর ধর্মীয় ধারণায় উন্নীত করা সম্ভব সে সম্পর্কে এখানে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, অনুরূপ উন্নত অবস্থায় তারা একদিন উপনীত হবে এবং এতদিন

নেতিবাচক ভূমিকা পালন করলেও আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ। ইংরেজরা ভারতে এতদিন শুধু প্রতিমা ভঙ্গকারী নগণ্য ভূমিকাই পালন করে এসেছে।'[১৯]

কিন্তু হান্টার সাহেবের সদিচ্ছা সদিচ্ছাতেই থেকে গেছে এবং ইংরেজ প্রতিমা ভঙ্গকারীর ভূমিকাই পালন করে গেছে। হিন্দুরাও ধর্মের গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে মুসলমানদের কাছে আসে নি, মুসলমানরাও অনুরূপভাবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে পরিত্যাজ্য বিবেচনা করে পশ্চিম এশীয় ইসলামিক সংস্কৃতিকেই আপন সংস্কৃতি বলে ধরে নিয়েছে।

ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের এই গোঁড়া ধর্মীয় চেতনা ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের একাংশকে আজও পর্যন্ত করে রেখেছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ভারতীয় সংস্কৃতি—হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি—এই দুই ভিন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষশীল খাতে প্রবাহিত হয়ে চলবে কি না আজ এই প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরীভাবে বিবেচ্য। ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি, সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ, যে সংস্কৃতি নিপীড়িত মানুষকে উচ্চতর গণতান্ত্রিক সংগ্রামে—প্রলেতারীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে, সাংস্কৃতিক জীবন দুই বিভক্ত ধারায় প্রবাহিত হলে সেই মহান দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারে কি না তা গুরুতর রূপেই বিবেচ্য। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা, সামাজিক আদান-প্রদান, ভাবের সংমিশ্রণ ও সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনের মধ্য দিয়েই সেই দায়িত্ব প্রতিপালিত হতে পারে। আর এই লক্ষ্য অর্জনে যে বাধা, অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারচ্ছন্নতা—তার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম ব্যতিরেকে সুস্থ, সুন্দর ও সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী সংস্কৃতির বিকাশও সম্ভবপর নয়।

শেষ কয়েকটি কথা

১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়েনান ফোরামে মাও-সে-তুং শিল্প ও সাহিত্যের উপর যে বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে ইয়েনান ফোরামের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমাদের এই সমাবেশের লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিক বিপ্লবী যন্ত্রটার একটা অঙ্গ হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যকে কি ভাবে ঠিকমত ব্যবহার করা যায়, কি ভাবে তা জনগণকে শিক্ষিত করা, শত্রুকে উৎসাদন করা, এবং জনগণ যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে অভিন্ন হৃদয় ও মন নিয়ে লড়াই করতে পারে তা-ই নির্ধারণ করা।'[২০]

ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রেও এই বক্তব্যের মর্মার্থ সমভাবেই

প্রযোজ্য। ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলির সঠিক বিশ্লেষণ করেই ভারতের সংগ্রামের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত দায়িত্বকে সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ করা সম্ভব। বিশেষ ভাবে আধুনিকতম কালে সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়াতেই ভাবগত ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি অতিরিক্ত সংকট। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার অংশ হিসাবে ভারতীয় সমাজও সেই সংকটের প্রভাব মুক্ত থাকতে পারে না। শুধু শিল্পকলা ও সাহিত্যই সংস্কৃতির সমার্থক নয়। সৌন্দর্যের নিয়মানুসারে মানুষের সৃষ্টিশীল সমগ্র কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতি। ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের এই সৃষ্টিশীলতায় যে প্রতিবন্ধকতা কাজ করে, সৌন্দর্যানুভূতিতে যে বিকৃতির আবির্ভাব ঘটে, নীতিবোধ এবং মানবিক সম্পর্কে'র যে অবনমন ঘটে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেই প্রশ্নগুলি আলোচিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিকতম কালে বুর্জোয়া জগতের সংস্কৃতি ও ভাবগত ক্ষেত্রে এবং এমন কি পারিবারিক জীবনেও যে ভীষণতম অবক্ষয় সূচিত হচ্ছে তা ধনতান্ত্রিক সমাজের সামগ্রিক জীবনকেই বিকৃত, উদভ্রান্ত ও উৎক্ষিপ্ত করে চলেছে। মূল্যবোধগুলির অবসান ঘটছে অতি দ্রুত। এ এক সাংঘাতিক অবস্থা। এই অবস্থা কেবল সমাজের তথাকথিত উচ্চস্তরকেই কলুষিত করছে তা নয়, সমাজের যারা নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী তাদের উপরও সংক্রামিত হচ্ছে এই বিষক্রিয়া—যা পরিণতিতে সমগ্র বিপ্লবী প্রলেতারীয় কর্মকাণ্ডকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। এই চরম সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের অনুপ্রবেশ ভারতের ক্ষেত্রেও সমভাবে পরিদৃষ্ট এবং তাই ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামে এই বিষয়টির প্রতি গভীরতর অভিনিবেশ প্রদান অত্যন্ত জরুরী আকারেই উপস্থিত হয়েছে। ভারতের প্রলেতারীয় সংগ্রাম এই দায়িত্বকে উপেক্ষা করে বা খাটো করে অগ্রসর হতে পারে না। সংস্কৃতি বা সৌন্দর্যানুভূতি গুটিকয়েক উপরতলার মানুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয় নয়। সমগ্র মার্ক'সীয় দর্শন অকাট্যভাবে এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণই উপস্থিত করেছে যে মানুষের শ্রমই সমগ্র সৃষ্টির মূল কথা এবং মানুষ সেই সৃষ্টি করে 'সৌন্দর্যের নিয়মানুসারেই'। পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলিতে মার্ক'স ও এঙ্গেলসের এই অখণ্ডনীয় ঐতিহাসিক সত্যকেই বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষের সাংস্কৃতিক সৃষ্টি শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের নৃ-তাত্ত্বিক বা প্রকৃতিগত গুণাবলীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। এটা অধিকতরভাবে নির্ভর করে মানুষের অস্তিত্বের সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার উপর। এই অবস্থার পরিবর্তন মানুষের নন্দনতাত্ত্বিক আদর্শ, ভাবগত চাহিদা এবং সাংস্কৃতিক

মানেরও পরিবর্তন ঘটায়। তাই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চিন্তা, সমাজ প্রক্রিয়া এবং সমাজের সদস্যদের শিক্ষা ও আত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে বিস্তার করে এক অপরিসীম প্রভাব।

সাহিত্য, শিল্পকলা—এক কথায় মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের চরিত্রই সামাজিক এবং তার বিকাশ ঘটে ঐতিহাসিকভাবে। তাই যুগে যুগে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে নির্দিষ্ট শ্রেণী-শক্তির আদর্শ ও নীতি অনুযায়ীই সৃষ্টি হয় সেই যুগের শিল্প-সংস্কৃতি। তাই অতীতে গ্রীক মহাকাব্য বা ভারতীয় মহাকাব্যগুলি যে সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও নির্দিষ্ট শ্রেণী-শক্তির আদর্শ অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছিল আজকের সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তার পুনরুক্তক সম্ভব নয়—সম্ভব নয় পুনরায় রেনাসাঁ যুগের শিল্প সৃষ্টিও। আজকের সংস্কৃতির সৃষ্টি আজকের ভারতবর্ষের সামাজিক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং নির্দিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ অনুযায়ীই হবে। কিন্তু সেই আদর্শ কোন শ্রেণীর? ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রবাহে যে ঝোঁক প্রবলতর, যে শক্তি ক্রমবর্দ্ধমান, যে শক্তি অপরাজেয়রূপে আবির্ভূত হতে চলেছে সেই শক্তি প্রলেতারীয় শক্তি, বুর্জোয়া শক্তি নয়। তাই আজকের ভারতে শিল্প সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটানো ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজন তা হবে সুনিশ্চিতভাবেই প্রলেতারীয় আদর্শের অনুযায়ী।

মার্কস দেখিয়েছেন যে ধনতান্ত্রিক বাস্তবতা শিল্পকলার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ধনতান্ত্রিক সমাজে শিল্পকলার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। মার্কসের বক্তব্যের মর্মার্থ এই যে মহত্তম শিল্প সৃষ্টির জন্য যে মানবিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলির প্রয়োজন, শোষণভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজে সেই মূল্যবোধ শুধু অনুপস্থিত নয়, এই সমাজের নীতি ও মূল্যবোধ মহত্তম শিল্প সৃষ্টির পরিপন্থীও বটে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজেও শিল্পীরা এই বৈপরিত্য ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন হন, তাঁদের সচেতনতার মাত্রা অনুযায়ী তাঁরাও আবার এই সমাজের পরিবেশেও এবং তাঁদের শ্রেণী উৎসের বিপরীত-ভাবেও মহত্তর শিল্প সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তাই ধনতান্ত্রিক সমাজেও সৃষ্টি হয়েছিল শেকস্‌পীয়র, ব্যালজাক বা রবীন্দ্রনাথের মত শিল্পীর। আবার প্রলেতারীয় সংগ্রামের তরঙ্গশীর্ষে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যেও আবির্ভূত হতে পারেন গর্কি বা লু-সুনের মত বিপ্লবী শিল্পীবৃন্দ।

মার্কস নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, কি ভাবে জনগণকে সমগ্র জগতের

সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে আয়ত্ব করতে হবে এবং প্রগতি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্বার্থে কেনই বা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকে অধ্যয়ন ও আত্মস্থ করে নিতে হবে।

স্রষ্টার প্রকৃত অর্থ কি, এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ করতে গেলে এটাই বলা যায় সঙ্গীত, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, অভিনয়, নৃত্যকলা, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য—সৃষ্টির যে কোন ক্ষেত্রেই বিচার করা যাক না কেন, কোন ক্ষেত্রেই স্রষ্টা বা শিল্পী কেবলমাত্র কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী একজন ব্যবস্থাপকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন না। এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের এমন একটা দিক আছে যে দিকটা ঠিক নিয়ম-মাফিক পর্যায়ে পড়ে না—সেই দিকটাই হল শিল্পীর সৃষ্টিধর্মীতা। কল্পনা এবং তারপর সৃষ্টি—এটাই তো অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের কর্মক্ষমতার পার্থক্যের নির্দেশক।

মার্কস জগতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করার কথা বলেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অর্থ কেবলমাত্র এই নয় যে যা কিছু অতীতের তাকেই শুধু একটু ধুলা ঝেড়ে নিলে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য করায়ত্ব হয়ে গেল। তা ছাড়াও যে প্রশ্ন—অতীতের সীমারেখাই বা নির্ধারিত হবে কি ভাবে? বাস্তবে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনই, সর্বকালেই তা সৃষ্টি হয়েছে বর্তমানতার মধ্যেই—আর এই বর্তমানই তো রূপান্তরিত হয় অতীতে অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে।

তাই সংস্কৃতির স্রষ্টার উপর জরুরীভাবে বর্তায় অনুসন্ধানের দায়িত্ব, যে অনুসন্ধান বর্তমানকে ঘিরে এবং যা-ই হবে আগামীদিনে অতীতের ঐতিহ্য। এই অনুসন্ধান কেবলমাত্র কয়েকটি বাঁধা নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারে না। এই অনুসন্ধান পরিচালিত হবে যেমন সৌন্দর্যের নিয়মানুসারে তেমনি তা অনুসরণ করবে সেই নির্দিষ্ট সমাজের বিপ্লবী চাহিদাকে। ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি, ভাষা, বর্ণ, জাতি, ধর্ম, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি নানান ধরনের বৈচিত্র্য, ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতি-ভেদ, প্রাদেশিকতা, কুসংস্কার, সামাজিক কুপ্রথা, নারী সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা, আবার পাশ্চাত্যের সাম্প্রতিকতম অবক্ষয়ী অথচ সংক্রামক ভাবধারাগুলি যা সমাজকে ক্রমশ উৎক্ষিপ্ত করে দিতে চায়, সমগ্র ঐতিহ্যগত সুন্দর ও কমনীয় মূল্যবোধগুলিকে নস্যাৎ করে দিতে চায় সেই ভাবৎ প্রশ্নসমূহই হবে এই অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। আবার এটা শুধু স্রষ্টার সৃষ্টির সমস্যাই নয়,

প্রলেতারীয় সংগ্রামেরও সমস্যা। প্রলেতারীয় সংগ্রামকেও আজকের ভারতের পরিস্থিতিতে এই সমস্যাগুলির মুখোমুখি হয়ে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই অগ্রসর হতে হবে। আজকের ভারতে প্রলেতারীয় সংগ্রামের এটাই চাহিদা। আর দেশের প্রলেতারীয় সংগ্রামের বিপ্লবী চাহিদার সঙ্গে যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় স্রষ্টার সৃষ্টি, তা হলে তাই হবে আজকের সার্থক সৃষ্টি। স্রষ্টার দক্ষতার ফলে এমন কি তা চিরায়ত সৃষ্টির স্তরেও উন্নীত হতে পারে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর প্রশ্ন তোলা যায় না। যেমন অতীতকে কি ভাবে বিচার করব বা বিপ্লবী চাহিদা অনুযায়ী নতুনকেই বা কি ভাবে সৃষ্টি করব—এটা কোন ছক দিয়ে বিচার করা সম্ভব নয়। মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নয়—এই বিশ্ববীক্ষা সৃষ্টির পথনির্দেশক। শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে এঙ্গেলস্ ড্যুরিং এর চিন্তাভাবনার যে সমালোচনা করেছিলেন তা এ ক্ষেত্রে বিশেষ স্মর্তব্য। এঙ্গেলস্ বলছেন,

"শিক্ষার নন্দনতাত্ত্বিক দিক দিয়ে হের ড্যুরিংকে সব কিছুই নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। অতীতের কাব্য মূল্যহীন। যেহেতু সমস্ত ধর্মকেই নিষিদ্ধ করতে হবে, তাই এটা বলাই বাহুল্য যে অতীতের কবিদের 'পৌরাণিক ও অন্যান্য ধর্মীয় পারিপাট্যের' বৈশিষ্ট্যসমূহকে তার চিন্তাধারা অনুযায়ী সহ্য করা যাবে না। 'কাব্যিক রহস্যবাদও' উদাহরণস্বরূপ 'গ্যেটে বা ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতেন' তাকেও নিন্দা করতে হবে। হের ড্যুরিং তাই তার মনকে এমনভাবে তৈরী করবেন যাতে তিনি আমাদের জন্য এমন সমস্ত মহৎ কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন যেগুলি 'হবে উচ্চতর কল্পনার দাবী এবং যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ' এবং তা প্রতিনিধিত্ব করবে নির্ভেজাল আদর্শকে যা 'জগতের বিশুদ্ধতাকে' নির্দেশ করবে।"[২১]

এঙ্গেলস্ এই সমালোচনার মধ্য দিয়ে শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সব কিছুকে ছাঁচে ফেলে নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধেই সতর্ক করলেন না, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গোঁড়ামিপূর্ণ ধ্যানধারণার বিরুদ্ধেও সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন।

কিন্তু এই সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অতীতকে জানা। দেশের অতীতকে না জেনে, অতীতকে মূল্যায়ণ না করে বর্তমানের সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করা যায় না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অতীতকে জানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গর্কি ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত লেখকদের মহাসম্মেলনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা

বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গর্কি আত্মসমালোচনা করে বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের অতীতকে জানি না।' তারপর লেখক সংঘের উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'আমাদের মহাসম্মেলন শুধু পাঠকদের কাছে একটা প্রতিবেদনস্বরূপই হবে না বা আমাদের গুণাবলীর একটা প্রদর্শনীও হবে না; সাহিত্যকে সংগঠিত করা এবং জাতীয় তাৎপর্য্যপূর্ণ শিল্পকর্ম সম্পর্কে তরুণ লেখকদের সুশিক্ষিত করার দায়িত্বও একে নিতে হবে যার লক্ষ্য হবে আমাদের দেশের অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন।'[২২]

ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের 'বিচ্ছিন্নতা' শ্রমিককে হৃতসর্বস্ব করে তোলে, জন্ম দেয় অমানবিকতার। এর অবসান ঘটতে পারে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসানের মধ্য দিয়েই—যখন 'বিচ্ছিন্নতা' 'অখণ্ডতায়' রূপান্তরিত হয়ে শ্রমিককে করে তুলবে শিল্পী, অমানবিকতাকে স্থানচ্যুত করবে সুস্থ, সুন্দর মানবিকতা। এই স্বচ্ছন্দ সৃষ্টি সম্ভব একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থাতেই। র‍্যাফায়েলের সৃষ্টিও যেমন নির্ভর করেছিল ফ্লোরেন্সীয় প্রভাবাধীন রোম সমাজে, তেমনি সমস্ত মহত্তম সৃষ্টির জন্যই প্রয়োজন হয় অনুকূল প্রভাবের। এই চূড়ান্ত অবক্ষয়ী ধনতান্ত্রিক সমাজের অবসানে, কমিউনিস্ট সমাজের অভ্যুদয়েই সূচনা হবে সেই যুগ যে যুগে স্রষ্টার সৃষ্টি চলবে স্বচ্ছন্দ গতিতে, শিল্প যেখানে কেবল কয়েকজন ব্যক্তির কর্মকাণ্ড হিসাবেই আবদ্ধ থাকবে না, যেখানে দৈহিক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের দ্বন্দ্ব থাকবে না—যেখানে প্রতিটি শ্রমিকই হবে শিল্পী। মার্কসের ভাষায়,

'সমাজ যখন সাম্যবাদী ধারায় সংগঠিত হবে তখন দূর হবে স্থানীয় বা জাতিগত ক্ষুদ্রতার কাছে শিল্পীর অধীনতা; আর এই অধীনতার উৎস সম্পূর্ণতই হচ্ছে শ্রমের বিভাগ, অবসান ঘটবে শিল্পকলার কোন বিশেষ বিভাগের কাছে শিল্পীর অধীনতা, যে অধীনতার জন্যই কেউ একজন বিশুদ্ধ চিত্রশিল্পী, কেউ বা স্থপতি ইত্যাদি; আর এই নামাকরণগুলিই নির্দেশ করে শিল্পীর বৃত্তিগত বিকাশের ক্ষুদ্রতা এবং শ্রম বিভাগের উপর তার নির্ভরতা, কমিউনিস্ট সমাজে চিত্রশিল্পী বলে কেউ থাকবে না, খুব বড়জোর থাকবে কিছু মানুষ যারা অন্যান্য কাজের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনেও অংশ গ্রহণ করবে।'[২৩]

মার্কস ও এঙ্গেলস্ এমন একটা সমাজের কল্পনা করেছিলেন যে সমাজে প্রতিটি মানুষই হবে শিল্পী। শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিল্পের সৃষ্টি—শ্রমের এই নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্যকে উপলব্ধি করেই মার্কস ও এঙ্গেলস্ এই

সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তাই শ্রমজীবী জনগণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম প্রবাহমান, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেই সংগ্রামের অন্তিম লক্ষ্য পরিপূর্ণ শিল্পী—মানুষ সৃষ্টির যা সম্ভব কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থাতেই।

১ রাম শরণ শর্মা, ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃঃ ২।

২ ঐ, পৃঃ ৪।

৩ ঐ, পৃঃ ৪২।

৪ ঐ, পৃঃ ৪৮—৪৯।

৫ এঙ্গেলস্, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পৃঃ ৬৫।

৬ ঐ, পৃঃ ৮৩।

৭ ঋগ্বেদ ১।১৭৩।২।

৮ ঐ, ৫।৩।২।

৯ ঐ, ১০।১৮।৮।

১০ এঙ্গেলস্ পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের, উৎপত্তি, পৃঃ ৭৯—৮০। এঙ্গেলস্ লিখেছেন, 'মর্গানের মতে হেটারারিজমের অর্থ একপতি-পত্নিত্বের পাশাপাশি পুরুষ ও অবিবাহিত নারীর বিবাহ বন্ধনের বহির্ভূত যৌনসঙ্গম এবং সভ্যযুগের আগাগোড়া বহুরূপে পল্লবিত ও ক্রমাগত প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তিরূপে বিকশিত।' ঐ, পৃঃ ৭৫।

১১ ঐ, পৃঃ ৮০।

১২ চৌ সে ত্সুং, দি মে ফোর্থ মুভমেন্ট, ইনটেলেকচুয়াল রেভলিউশন ইন মডার্ণ চায়না, স্টাণ্ডার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ক্যালিফোর্নিয়া, পৃঃ ৩৬৪।

১৩ এঙ্গেলস্, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পৃঃ ৮৪।

১৪ আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃঃ ২৫।

১৫ ঐ, পৃঃ ২৩।

১৬ বদরুদ্দিন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃঃ ৫৬।

১৭ হোসেন্থুর রহমান, হিন্দু মুসলিম রিলেশনস্ ইন বেঙ্গল, ১৯০৫—১৯৪৭, পৃঃ ১০৪।

১৮ বদরুদ্দিন উমর, সাম্প্রদায়িকতা, পৃঃ ৫৭—৫৮।

১৯ ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টার ; দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান, পৃঃ ১৮৫—৮৬, এম, আনিসুজ্জামান অনুদিত, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

২০ মাও-সে-তুং, নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৪।

২১ এঙ্গেলস্, এ্যান্টি-ড্যুরিং, পৃঃ ৪৪৩।

২২ ম্যাক্সিম গর্কি, সোভিয়েৎ সাহিত্য, সোভিয়েৎ লেখক কংগ্রেস ১৯৩৪, পৃঃ ৬৯।

২৩ মার্কস ও এঙ্গেলস্, জার্মান ইডিয়লজি, কালেক্টেড ওয়ার্কস, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪।

অনুক্রমণী